5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

SOCIOLOGY

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

5 YEAR QUESTIONS
WITH
SAMPLE ANSWERS

SOCIOLOGY

West Bengal Council of Higher Secondary Education
Vidyasagar Bhavan
9/2, Block DJ, Sector II, Salt Lake, Kolkata-700 091

Published by :

West Bengal Council of Higher Secondary Education

Published on :

October, 2020

Printed By :

Saraswaty Press Limited

(West Bengal Government Enterprise)

Price : Rs. 40.00

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ

বিদ্যাসাগর ভবন

৯/২ ব্লক ডি.জে. সেক্টর-২ সল্টলেক সিটি

কলকাতা-৭০০০৯১

নং ঃ L/PR/156/2020 তারিখ ঃ 10/10/2020

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের উদ্যোগে এবং সংসদের অ্যাকাডেমিক বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই প্রথম ২০১৫-২০১৯ এই পাঁচ বছরের ইংরেজী, সংস্কৃত, নিউট্রিশন, এডুকেশন, জিওগ্রাফি, হিন্দি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ফিলোসফি এবং সোসিওলজি এই ৯টি বিষয়ের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের বই প্রকাশ করা হলো।

বর্তমান বছরে কোভিড-১৯ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে পঠন-পাঠনের অসুবিধে এবং ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের চাহিদা বিবেচনা করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তর সম্পর্কে ধারণা তৈরী করতে সংসদের এই উদ্যোগ।

ইতিমধ্যে সংসদ বর্তমান সিলেবাসের Sample Question সহ Question Pattern, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'Concepts wity Sample Question and Solution' এবং Mock Test Papers প্রকাশ করেছে এবং পরীক্ষার্থীদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়েছে।

আমাদের আশা এই বইগুলির মাধ্যমে কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা প্রভূত উপকৃত হবে।

মহুয়া দাস

সভাপতি

পঃ বঃ উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদ

সূচিপত্র

5 YEAR QUESTIONS WITH SAMPLE ANSWERS

SOCIOLOGY

Year	Page No.
2015 (Part-A & Part-B)	1-23
2016 (Part-A & Part-B)	24-44
2017 (Part-A & Part-B)	45-66
2018 (Part-A & Part-B)	67-88
2019 (Part-A & Part-B)	89-107

SOCIOLOGY

2015

বিভাগ -ক (40 Marks)

1) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) (8 × 5)

(a) ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের বিকাশ সম্বন্ধে লেখ। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করো। (5+3)

উঃ ভারতবর্ষে তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে নতুন হলেও, বহু প্রাচীনকাল থেকে সমাজ সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছে। মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, আইন-ই-আকবরী, বিভিন্ন ভূ-পর্যটকের বিবরণে ভারতের সমাজ সংস্কৃতির ছবি ফুটে ওঠে। কিন্তু সমাজতত্ত্ব নামক বিষয়ের ছাতার তলায় তা হয়নি। সমাজতত্ত্বের বিকাশের পর্যায়গুলি হল নিম্নরূপ–

প্রথম পর্যায় ঃ ভিত্তিমূলক পর্যায় (১৭৭৩-১৯০০) ঃ-

(i) এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) ঃ এই সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইউরোপীয়দের হাত ধরে তাত্ত্বিকভাবে ভারতীয় ও প্রাচ্যের সমাজ নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।

(ii) বেথুন সোসাইটি (১৮৫১) ঃ এই সংস্থা স্থাপনের মাধ্যমে সমাজবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ শুরু হয়। কিছু ইউরোপীয় তাত্ত্বিক ও উদারবাদী ভারতীয় এই সংস্থায় সমাজ সংক্রান্ত চর্চা শুরু করেন।

(iii) বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭) ঃ এই সভাতে বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞান নিয়ে সামগ্রিক আলোচনা হত, যাদের মধ্যে 'সমাজতত্ত্ব' অন্যতম।

এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থাগুলির নানান পত্র-পত্রিকা এবং দৃষ্টবাদের বিকাশ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তি তৈরী করেছিল ভারতবর্ষে।

এসবের পাশাপাশি নবজাগরণ, তৎকালীন বুদ্ধিজীবী ও মিশনারীদের অবদান ও প্রশাসনিক প্রয়োজন সমাজ সংক্রান্ত আলোচনাকে শক্তিশালী করে তোলে।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ পেশাদারীকরণ পর্যায় (১৯০১-১৯৫০) ঃ-

(i) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯১৯ সালে স্কটিশ জীববিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেজের উদ্যোগে এখানে সমাজতত্ত্ব ও পৌরবিদ্যা বিভাগটি চালু হয়। ১৯৩০ সালে সমাজতত্ত্বের স্বতন্ত্র বিভাগ চালু হয়। জি.এস. ঘুরে, এস.ডি. কেটকার প্রমুখ অধ্যাপক ও তাঁদের ছাত্র-ছাত্রী, এম.এস.এ রাও, ইরাবতী কার্ভে, এম.এন. শ্রীনিবাস প্রমুখরা ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্ব বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছেন।

(ii) অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ১৯২১ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৭ সালে পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রমে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন শুরু হয়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ স্বাধীনোত্তর বা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ পর্যায় ঃ-

(i) প্রাতিষ্ঠানিক ক্রমবৃদ্ধি ঃ স্বাধীনতার পর মাত্র ৩০ বছরের মধ্যে দেখা যায় দেশের ১২০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৮০ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতোকোত্তর পর্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। এদের মধ্যে দিল্লী, যোধপুর, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬ সালে কল্যাণী, ১৯৭৫/৭৬ সালে কলকাতা, ১৯৮৮ সালে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন শুরু হয়।

(ii) গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি ঃ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও I.C.S.S.R (১৯৬৯), C.S.R., I.C.H.R., I.C.P.R. প্রভৃতি সংস্থায় গবেষণার সুযোগ সমাজতত্ত্বকে বিষয় হিসাবে বিশেষ মাত্রা দেয়।

(iii) পেশাদারী সংস্থা ও পত্রিকা ঃ Indian Sociological Society, Anthropological Society ইত্যাদি এবং তাদের মুখপত্রগুলি সমাজতত্ত্বকে পেশাদারী ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরো শক্তোপোক্ত ভিত্তি পেতে সাহায্য করে।

এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে সমাজতত্ত্বের তাত্ত্বিক বিষয় হিসাবে বিকাশ ঘটতে থাকে এবং ঘটে চলেছে।

♦ **বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ঃ** ভারতবর্ষে বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের প্রথম চর্চা শুরু হয় ১৯১৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কটিশ জীববিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেজ ছিলেন সমাজতত্ত্ব ও পৌরবিদ্যা বিভাগের প্রথম অধ্যাপক। সমাজতত্ত্বের নিজস্ব বিভাগ চালু হয় ১৯৩০ সালে। স্বাধীন বিভাগের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক হলেন গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে। ঘুরে শতাধিক গ্রন্থ লিখে সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে আলাদা রূপ দিয়েছেন। এছাড়া তাঁর সময়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থী গবেষক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ঘুরের সমসাময়িক চিন্তাবিদ্ ছিলেন এস. ডি. কেটকার ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ঘুরের প্রচেষ্ঠায় ১৯২০ সালে প্রথম Indian Sociological Society-এর মুখপত্র Sociological Bulletin প্রকাশিত হয়। তাঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী পরে সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে খ্যাত হয়েছেন, যথা– এম.এস.এ. রাও, ইরাবতী কার্ভে, এম.এন. শ্রীনিবাস, এ.আর. দেশাই, আই.পি. দেশাই, এম.এস. গোরে, ডি. নারাইন প্রমুখ। এঁনাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বিষয়টির খ্যাতি বিস্তার করেছেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা বিভাগীয় প্রধান বা

অধ্যাপক হিসাবে খ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কে.এম. কাপাডিয়া, আন্দ্রে বেতাই, ব্রিজরাজ চৌহান, যোগিন্দার সিং এবং সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দ্রা মুন্সি, কমলা গণেশ প্রমুখ।

অথবা (a)

সাব-অলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গী বলতে কী বোঝ? এই প্রসঙ্গে রণজিৎ গুহর ভূমিকা সম্বন্ধে লেখ। **(3+5)**

উঃ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির কাঠামোতে নবীনতম সংযোজন সাব-অলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্তেনিয় গ্রামশির রচনায় এই ধারণাটি প্রথম পাওয়া যায়। সাব-অলটার্ন কথাটির দ্বারা সমাজের সেই সকল মানুষদের বোঝানো হয় যারা শ্রেণি, জাতি, ভাষা ও লিঙ্গগত দিক থেকে অন্যদের অধীন, তাই তারা নিম্নবর্গীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদান হল 'history told from below' বা 'তলা থেকে বলা ইতিহাস'। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক-প্রশাসনিক ক্ষমতাবানদের আধিপত্যাধীন পুঁজিবাদী যন্ত্র সভ্যতার নীচে চাপা পড়া বিস্মৃত, অবহেলিত নিম্নবর্গের মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, নিপীড়ণ, বঞ্চনা, চেতনা ও মানসিকতার নানা বৈশিষ্ট্য, তাদের বিবর্তন প্রভৃতি তাদের মতন করে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সাব-অলটার্ন বা নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলে। এই নিম্নবর্গী মানুষরা সত্যিকারের 'প্রলেতারিয়েত'। বিশিষ্ট ফরাসি দার্শনিক ও মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ফ্রাঞ্জ ফানো তাই বলেছেন যে, 'জগতের লাঞ্ছিত' এই মানুষগুলি নিজের দেশেই পরবাসী, নিজের জমির মালিকানাহীন, নিজের শরীর ও মনেরও মালিকানা হারিয়ে হয়েছে সত্যিকারের লাঞ্ছিত।

♦ **রণজিৎ গুহর ভূমিকা ঃ** ১৯৮০ দশকের অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাঙালি রণজিৎ গুহর নেতৃত্বে সাব-অলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা শুরু হয়। রণজিৎ গুহর উদ্যোগে এক নতুন গোষ্ঠীর গবেষকগণ সমাজচর্চার ক্ষেত্রে ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেন যা 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' নামে পরিচিতি পায়। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় রণজিৎ গুহর বই 'The Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India'। এই গ্রন্থে প্রথম ব্যাখ্যা করা ঔপনিবেশিক ভারতের শতবর্ষের পুরানো কৃষক বিদ্রোহের উল্টোদিকের ইতিহাস। এই তথ্য পরিবেশন করা হয় অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেখানে নিম্নবর্গের ব্যক্তিদের ক্রিয়াকলাপকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথকভাবে ব্যাখ্যা না করে নিম্নবর্গের দৃষ্টিতেই সমগ্র সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও ভাব-আদর্শের জগৎকে বিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি জাতিভেদ প্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্থান, ব্রিটিশ শাসনে ইংরেজি শিক্ষা, নবজাগরণ, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ, বিভিন্ন সংগঠন ইত্যাদির স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ করা হয়। কিন্তু সমালোচকরা এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস চর্চার পরিপন্থী বলে 'বিরোধী ইতিহাস'- এর অ্যাখ্যা দিলেন। এই অভিযোগ স্বীকার করে পাল্টা যুক্তি দেওয়া হল যে নিম্নবর্গীয়রা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তাই তারা প্রচলিত ইতিহাস

ও সমাজবিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি অস্বীকার করে। এটি তাই বিরোধী চালিকা শক্তি। নিম্নবর্গের ব্যক্তিরা নিজেদের ভাগ্য তাদের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তৈরী করবে এবং নিজেদের কাজের মালিক নিজেরা হয়ে উচ্চবর্গের সমস্ত আধিপত্য, অত্যাচার, শোষণ, নিপীড়ণ প্রভৃতিকে অস্বীকার করবে– এটাই মূল বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় রণজিৎ গুহ নতুন যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর চর্চার দ্বারা সমাজের প্রকৃত প্রলেতারিয়েতদের আলোচনা করেছেন তাতে প্রায় বিশ্বের সব আঞ্চলিক ইতিহাস যুক্ত হয়েছে। এটি তাই সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় এক বিরাট প্রাপ্তি। তবে নিম্নবর্গ সমগ্র সমাজের কথা না বলতে পারার জন্য একে সম্পূর্ণ বলা যায় না।

(b) মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ধর্ম সম্বন্ধে ভাবনা লেখ। আধুনিক ভারতীয় সমাজে এই ভাবনা কতখানি প্রযোজ্য? (5+3)

উঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একজন স্বাধীনতা আন্দোলনকারী, ভারতে আধুনিক সংবাদপত্র ধারার প্রবর্তক, দার্শনিক ও শিক্ষা সংস্কারক। ছোটবেলায় রক্ষণশীল ও মুসলিম পরিবারে জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা হলেও, তাঁর অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা আজও আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক। তাঁর জীবনের কয়েকটি পর্যায়ের মাধ্যমে তাঁর ধর্মীয় ভাবনা তুলে ধরা হল—

১. শিক্ষা লাভ ঃ মাত্র ১১ বছর বয়সেই পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে তিনি আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। মাত্র ১৬ বছর বয়েসে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্মের পাণ্ডিত্যের জন্য 'মৌলানা' উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু প্রবল 'যুক্তিবাদ' তাকে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে।

২. সংস্কার ও উদারবাদী ধর্মীয় চিন্তাভাবনার বিকাশ ঃ মুসলিমদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বিভেদ, ইংরেজদের প্রতি মুসলিম সমাজের আনুগত্য, সেই পথ ধরে যুক্তি ও দৈবশক্তির মধ্যে সমন্বয়সাধন, নাস্তিকতা প্রভৃতি প্রশ্নগুলি তাঁকে নাড়া দিতে থাকে। এই সময় (২২ বছর বয়স) নিজের পারিবারিক ধর্মীয় চিন্তাধারা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন। এক স্বাধীন, উদার, ধর্মীয় দর্শনের শরিক হন এবং 'আজাদ' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। এরপর জাতীয় স্বার্থের কথা ভেবে গান্ধীজীর হাত ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন।

৩. পত্রিকা প্রকাশনা ঃ ১৯২২ সালে কলকাতা থেকে উর্দু ভাষায় 'আল হিলাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতা ও লেখনীর সাহায্যে তিনি মুসলমান সমাজকে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা এবং সমাজ ও ধর্মসংস্কারকের কাজে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন। কিন্তু গোঁড়া মুসলিমদের অসন্তোষ ও ব্রিটিশ আইনের মাধ্যমে তাঁর সংবাদপত্র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

৪. সব ধর্ম সমন্বয়বাদ ঃ তিনি মনে করতেন সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তাই 'অর্জমান' শীর্ষক গ্রন্থের মাধ্যমে ভারতবর্ষের 'ধর্ম নিরপেক্ষ' রূপটি তুলে ধরেন এবং হিন্দু-মুসলিমদের পারস্পরিক সহনশীলতা ও সমন্বয়ের প্রতি জোর দেন।

৫. দারউল ইরশাদ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষাতেও যাতে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবেশ ঘটে তার জন্যও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। এই চিন্তাকে সামনে রেখে ১৯১৪ সালে 'দারউল ইরশাদ' নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

৬. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ভারত ভাগের বিরোধিতা ঃ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন জিন্নার 'দ্বি-জাতি' তত্ত্বের মাধ্যমে দেশের বাটোয়ারা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তাঁর এই চেতনা বেশিরভাগ মুসলিম সমাজের কাছে পৌঁছায়নি।

♦ আধুনিক ভারতীয় সমাজে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ধর্মীয় ভাবনার প্রযোজ্যতা ঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন সমাজ সংস্কারক, ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবনের কর্মকাণ্ডে ও লেখনীতে সেই ছবিই ফুটে ওঠে।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ যে কোনো স্থায়ী সমাধান নয়, আজ তা প্রমাণিত। কারণ স্বাধীনতা ও দেশভাগের ৭৪ বছর পরও দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি। সীমান্ত ও রাজনীতিতে সবসময়ই তাই সেই উত্তেজনা থেকেই গেল।

এছাড়াও দেশের মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক সংগঠনের প্রভাব বৃদ্ধি, দাঙ্গা, অসহিষ্ণুতা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চরিত্রকে বারবার কলঙ্কিত করছে। মৌলানা আজাদের চিন্তা-চেতনা মুসলিম সমাজসহ সকল ধর্মের মানুষের কাছে পৌঁছানো যেত, তাহলে আমরা আরো সহনশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষকে পেতাম।

তাই 'ভারতরত্ন' মৌলানা আজাদের উদারবাদী ধর্মীয় ভাবনা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরো ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য'-এর ভারতকে খুজে পেতে গেলে তিনি আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যবাহী।

(c) জাতিব্যবস্থার ধারণা সম্বন্ধে লেখো। জাতিব্যবস্থার মুখ্য বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে লেখো। (3+5)

উঃ সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় হিন্দু সমাজের অনন্য বৈশিষ্ট্য জাতিভেদ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত। প্রাচীন শাস্ত্রগুলি ও ধর্মগ্রন্থগুলিও এই প্রথাকে সমর্থন করে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যাসহ।

স্পানিশ শব্দ 'Casta' থেকে ইংরেজি 'Caste' শব্দের উৎপত্তি যার অর্থ কুল বা জাতি। পর্তুগীজরাই প্রথম 'জাত' শব্দটি ব্যবহার করে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা বোঝার জন্য। বাংলায় এই শব্দটির উৎপত্তি হল 'জন' ধাতু থেকে, যার অর্থ হল 'জন্ম'। জাতির ভিত্তি যেহেতু জন্মসূত্র তাই এটি অপরিবর্তনীয়। এম.এন. শ্রীনিবাস বলেছেন যে, জাতপ্রথা হল একটি সর্বভারতীয় ব্যবস্থা যার মধ্যে প্রত্যেক স্থান জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে তিনি ধর্ম ও কর্মের ধারণায় গুরুত্ব দিয়ে ধর্মানুসারে ব্যক্তির জাতপাতের নিয়মাবলী পালন এবং কর্মানুসারে ব্যক্তির বিশেষ একটি জাতে জন্মগ্রহণের কথা বলেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে বৃত্তি, ধর্মীয় পবিত্রতা-অপবিত্রতা ও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কিছু আরোপিত মর্যাদার ধারণার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় জাতি ব্যবস্থায় এবং সমাজের সব সম্পর্ক এভাবেই স্থির হয়।

আবার ভারতের জাতিভেদ প্রথা চতুর্বর্ণভিত্তিক। ঋকবেদের পুরুষ সুক্ত অনুযায়ী সৃষ্টির আদি প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মনুষ্যকুলের স্রষ্টা। তাঁর মুখ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব্রাহ্মণ বা নরোত্তম, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদযুগল থেকে শুদ্র। তাই সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে ব্রাহ্মণ ও সর্বনিম্নে শুদ্রের অবস্থান। এই ধর্মীয় বিভাজনের সাথে কর্ম বিভাজনও যুক্ত। তাই ব্রাহ্মণের কাজ পূজাপাঠ, শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যা এবং অধ্যাপনা; ক্ষত্রিয়ের কাজ ছিল প্রজা-পালন, দেশ শাসন ও যুদ্ধ পরিচালনা; বৈশ্যের কাজ ছিল পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য এবং পূর্বে তিন বর্ণের সেবা করাই ছিল শুদ্রের কাজ। এই চতুর্বর্ণভিত্তিক জাতিব্যবস্থা ছিল কঠোরভাবে অপরিবর্তনীয় ও স্থবির। পাশাপাশি প্রত্যেক জাতিকে নিজ নিজ জাতির নিয়ম ও উপনিয়ম কঠোরভাবে পালন করতে হত, অন্যথায় কঠিন শাস্তিবিধান ছিল। তবে হিন্দু ধর্মে এই চার বর্ণ ছাড়াও আরো এক জাতি ছিল, তাদের অস্পৃশ্য বা বলা হত। এদের কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না, শুদ্রেরও পরে ছিল এদের স্থান।

◆ অধ্যাপক ঘুরে তাঁর কয়েকটি বই, Caste and Class in India (1950-56), Caste, Class and Occupation (1961), Caste and Race in India (1970) ভারতীয় জাতি-ব্যবস্থার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেছেন, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণগুলি নিম্নরূপ—

(ক) ক্রমোচ্চ বিভাজন ঃ উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠত্ব-হীনতায় ভিত্তি করে ক্রমোচ্চ বিন্যাসের উপরে ব্রাহ্মণ ও নীচে শুদ্র থাকে। যদি শুদ্রেরও পরে অবস্থান করে 'দলিত', যারা out-caste বা জাতিবহির্ভূত।

(খ) খণ্ডিত বিভাজন ঃ প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত বিধি ব্যবস্থা ও নিষেধাজ্ঞার দ্বারা সেই জাতির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থা নজরদারি করত জাতি পঞ্চায়েত।

(গ) খাদ্যাভাসে বিধিনিষেধ ঃ খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতি জাতির ক্ষেত্রে কিছু বিধিবদ্ধতা দেখা যায় এবং জাতি অনুযায়ী তাতে ভিন্নতা ছিল। যেমন– উত্তর ভারতে শুধুমাত্র ঘি দ্বারা

তৈরী 'পাক্কা খাবার' ব্রাহ্মণরা গ্রহণ করতেন যে কোনো জাতির কাছ থেকে। কিন্তু ব্রাহ্মণকে অপর ব্রাহ্মণ 'কাচ্চ খাবার' অর্থাৎ জল দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য খাওয়াতে পারত, শুধুমাত্র নীচু জাতির কোন অধিকার ছিল না এই বিষয়ে।

(ঘ) সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ঃ জাতির সঙ্গে উচ্চ-নীচ জাতিকেন্দ্রিক স্পর্শ সংক্রান্ত শুচিতা রক্ষার বিষয়টি কঠোরভাবে পালন করা হত। অন্যথায় কঠিন শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্ত ছিল বিধান। তাই কেরালার বায়ার (নীচুজাতি), নাম্বুদরি ব্রাহ্মণের সাথে ছোঁয়া বাঁচিয়ে কথা বলত। আবার নিম্নজাতির তিয়ান ও পুলয়াকে ব্রাহ্মণের থেকে ৩৬ ও ৯৬ ফুট দূরে থাকতে হত।

(ঙ) কোনো কোনো জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতা ঃ জাতি ব্যবস্থায় নীচু জাতের ব্যক্তিরা নানান সামাজিক ও ধর্মীয় অক্ষমতার শিকার হত। যেমন এদের শহর থেকে বহু দূরে বাস করতে হত যাতে তাদের ছায়া দ্বারা উচ্চ কোন জাতির কেউ দূষিত না হয়। আবার যত্রতত্র এরা থুতু ফেলতে পারত না একই কারণে। এক্ষেত্রে থুতু ফেলা বিষয়টি গৌণ ছিল মুখ্য হল তা স্পর্শের ফলে অশুদ্ধ হওয়া বিষয়টি।

আবার দলিতরা সকল বিষয়ে ছিল বঞ্চিত। তাই তো অন্যতম সংবিধান প্রণেতা ও ভারতের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে ছোটবেলায় দলিত হওয়ায় সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী দলিতদের 'হরিজন' বলে আখ্যা দেন।

(চ) বিশেষ জাতির সুযোগ-সুবিধা ঃ জাতি ব্যবস্থায় উচ্চে অবস্থিত ব্রাহ্মণেরা, পবিত্র ও নরোত্তম হওয়ার সুবাদে নানান সামাজিক সুবিধা পেতেন। যেমন- সামাজিক রীতি বা প্রায় বাধ্যতামূলক রীতি ছিল ব্রাহ্মণদের নমস্কার, প্রণাম ও অভিবাদন জানানো কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য জাতির প্রতি এই নিয়ম ছিল না। এছাড়া সামাজিক সকল বিষয়ে তারাই সর্বদা অগ্রাধিকার পেতেন এবং বাকি জাতির ব্যক্তিদের অধিকার নিয়ন্ত্রণ করতেন।

(ছ) পেশাগত বিধিনিষেধ ঃ সমাজের পেশাগত ক্ষেত্রেও শ্রেষ্ঠতা, পবিত্রতা ও হীনতার ভিত্তিতে স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল। এটি জাতিভেদের অন্যতম ভিত্তি। পেশা নির্বাচন ছিল বংশানুক্রমিক ও জাতি ভিত্তিক। তাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র আর শুদ্রের পেশা ছিল অপবিত্র তথা নিকৃষ্ট।

(জ) বিবাহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ঃ জাতি আন্তর্বৈবাহিক গোষ্ঠী হওয়ায় স্বজাতির মধ্যে বিবাহ হত। তবে স্বগোত্র, স্বপিণ্ড বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য সামান্য হারে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ চালু ছিল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে পালন করতেন।

এছাড়াও 'সমপাঙক্তেয়তা' অর্থাৎ সমজাতির ব্যক্তিদের সাথেই শুধুমাত্র পঙক্তিভোজন করা যেত। আবার পদবি অনুযায়ী জাতির পরিচয় জানা যেত। তাই প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট পদবি ছিল। সবশেষে বলা যায় যে ব্যক্তির মর্যাদা ছিল সম্পূর্ণ আরোপিত একদম জন্মকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তির জীবদ্দশায় তো বটেই মৃত্যুর পরও এটি সক্রিয় থাকত।

অথবা (c)

পরিবারের দুটি প্রকার লেখো। পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলী কি কি? (3+5)

উঃ মানবসমাজের একটি শাশ্বত ও বিশ্বজনীন সংগঠন হল পরিবার। কিন্তু দেশ-কাল ভেদে এবং বিভিন্ন সমাজের ভৌগলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার জন্য কাঠামো ও সংগঠনের দিক থেকে পরিবারের নানা প্রকার আছে। নিম্নে দুটি প্রকার আলোচনা করা হল–

একক পরিবার (Nuclear Family) ঃ পরিবারের সর্বাপেক্ষা ছোটো বা ক্ষুদ্র রূপ হল একক পরিবার। এই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী এবং তাদের এক বা একাধিক সন্তান থাকে, অন্য কোনো আত্মীয়-স্বজন থাকে না। বর্তমান আধুনিক সমাজে প্রায় সর্বত্রই এই ধরনের পরিবার প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

যৌথ পরিবার (Joint Family) ঃ পরিবার ব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হল যৌথ পরিবার। যে সকল পরিবারে দুই বা ততোধিক প্রজন্ম একত্রে বাস করে, একই রান্নাঘরে তৈরী খাবার খায়, যারা সম্পত্তির সম্মিলিত মালিক, যারা পরিবারের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সকলে অংশগ্রহণ করে এবং যারা রক্ত বা বৈবাহিক বা আত্মীয়তার সম্পর্কে সম্পর্কিত সেই পরিবারকেই যৌথ পরিবার বলে। বর্তমান আধুনিক সমাজের তুলনায় তার পূর্বের সমাজে এই ধরনের যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব ব্যাপকভাবে দেখা যেত।

♦ **পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলি ঃ** পরিবারের কার্যাবলি প্রসঙ্গে সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা যায়। তবে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থ এবং ব্যক্তি-মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের বিভিন্ন কার্যাবলির আলোচনা নিম্নরূপ–

১. যৌন প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের যৌন আকাঙ্খার পারিবারিক সংগঠনের মধ্যে বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজ-স্বীকৃত উপায়ে পরিতৃপ্তি ঘটে। তার ফলে সমাজে যৌন ব্যভিচার ও বিশৃঙ্খলার বহুলাংশে কম ঘটে। পরিবার ব্যবস্থাই এই সম্ভাবনাকে দূর করে। বাৎসায়নের 'কামসূত্র' অনুযায়ী, "The sexual satisfaction is one of the main aims of family life."

২. সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন ঃ বিবাহের পরে পরিবারের মধ্যে দম্পতির যৌন মিলনের ফলশ্রুতি সন্তানের আগমন। এইভাবে পরিবারের অস্তিত্ব ও বংশের ধারা বজায় থাকে। তাই পরিবারই হল সন্তান প্রজননের একমাত্র সমাজ স্বীকৃত সংস্থা।

জন্মগ্রহণের পর অসহায় অবস্থা থেকে শিশুর স্বাবলম্বী হওয়া পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময় পরিবারের দ্বারা সুষ্ঠ সেবা-যত্ন ও প্রতিপালন অনস্বীকার্য। নচেৎ শিশুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়।

৩. সমাজিকীকরণ ঃ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম পরিবার। জন্মগ্রহণের পরে শিশুর জৈবিক জীব থেকে সামাজিক জীবে রূপান্তরে সমাজ প্রচলিত নিয়ম, আইন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, লোকাচার, লোকনীতি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ ও অবিধিবদ্ধ বহু বিষয় আয়ত্ত করার প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ, এক্ষেত্রে পরিবারে ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪. অর্থনৈতিক ভূমিকা ঃ পরিবার তার সদস্যদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে সাধ্যমত। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। পূর্বে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় পরিবারগুলির ধরন ছিল Production unit অর্থাৎ অর্থ রোজগারের সাথে প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যাদির অধিকাংশ বাড়ির মধ্যে উৎপাদন হত। কিন্তু বর্তমানে একক পরিবারগুলি হল Consumption unit অর্থাৎ এখানে পরিবারের প্রয়োজনীয় অর্থই রোজগার হয়ে থাকে, ভোগ্যদ্রব্যের জন্য বাজারের ওপর নির্ভর করতে হয়।

৫. দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা ঃ পরিবার তার সদস্যদের দৈহিক ও মানসিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। অন্যথায় ব্যক্তির মধ্যে হীনমন্যতা ও নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে আশঙ্কা ও আতঙ্কবোধ সৃষ্টি হয়।

৬. মানসিক আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিরই জৈবিক চাহিদার পাশাপাশি বেশ কিছু মানসিক চাহিদাও থাকে। মানুষের প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, সহানুভূতি-স্নেহ প্রভৃতি আবেগ-অনুভূতির বিষয়গুলি পরিবারের মধ্যেই উন্মোচিত, বিকশিত ও পরিতৃপ্ত হয়।

৭. সামাজিক মর্যাদা প্রদান ঃ জন্মসূত্রে ব্যক্তি পারিবারিক পরিচিতির মাধ্যমে তার পরিচয়, সামাজিক মর্যাদা পায় এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। সামাজিক স্তরবিন্যাসেও ব্যক্তির অবস্থান তার পরিবারের পরিচিতি ধরে নির্ধারিত হয়।

৮. ধর্ম সম্পর্কিত ভূমিকা ঃ পরিবারের দ্বারাই ব্যক্তি প্রাথমিকভাবে ধর্মের জ্ঞান ও ধর্মীয় আচরণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারে। পরিবারই শিশুর মধ্যে বিশ্বাস, পাপ-পূণ্য, পবিত্র-অপবিত্রতা, প্রার্থনা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা দেয়।

৯. শিক্ষা বিষয়ক ভূমিকা ঃ পরিবার হল শিশুর প্রথম শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সংস্থা। আগেকার পরিবারগুলিতে শিশুরা বিধিবদ্ধ জ্ঞানের সাথে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও লাভ করত।

১০. সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্বাচন ঃ পারিবারিক সম্পত্তি সংরক্ষণ ও উত্তরাধিকার নির্বাচনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় পরিবারের প্রকৃতির ভিন্নতার কারণে এই পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা যায়।

১১. সংস্কৃতির সংরক্ষক ঃ ব্যক্তি পরিবারের মধ্যে থেকে তার দেশ ও সমাজের বিভিন্ন সংস্কৃতির উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। এই প্রক্রিয়া এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত হয়।

১২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ঃ পরিবার ব্যক্তিকে বিবিধ সামাজিক নিয়ম-নীতি সম্পর্ককে অবগত করে এবং নিয়ম ভঙ্গ করলে তাকে শাসন করে। এইভাবে সমাজের কাঙ্খিত আচরণ করে ব্যক্তিরা সামাজিক সংহতি ও নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে থাকে।

(d) শিক্ষায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান সম্পর্কে লেখো। বর্তমান ভারতীয় সমাজে এর প্রাসঙ্গিকতা সম্বন্ধে লেখো। (5+3)

উঃ বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথ প্রদর্শক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি, যুক্তিবাদী চিন্তাভাবনার প্রসার, নারীশিক্ষার বিস্তার প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন।

১. প্রাথমিক শিক্ষা ঃ বিদ্যাসাগর প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তৎকালীন বিট্রিশ সরকারকে বেশ কিছু প্রস্তাব দেন। তার মধ্যে– (ক) শিক্ষার মাধ্যম (মাতৃভাষা) (খ) পাঠ্যসূচী, (গ) মডেল স্কুল, (ঘ) বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থা, (ঙ) শিক্ষক-শিক্ষণ (চ) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. গণশিক্ষা ঃ তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যে শিক্ষা ও সাক্ষরতা ছড়িয়ে দেওয়া। মাতৃভাষায় শিক্ষার প্রসার ও প্রাথমিক বিদ্যালয় বিস্তারের মাধ্যমে এই কাজ তিনি অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যান।

৩. স্ত্রী শিক্ষা ঃ ১৮৪৯ সালের মে মাসে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত হয়, যা পরবর্তীকালে 'হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয় (বর্তমানে 'বেথুন স্কুল')। কলকাতা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলি প্রভৃতি জেলায় তার উদ্যোগে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় তৈরী হয়। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়ভার নিতে রাজি না হওয়ায় তিনি

'নারী শিক্ষার ভাণ্ডার' নামক সংস্থা গঠন করে চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেন।

৪. উচ্চশিক্ষা ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Calcutta Training School (Metropolitan Institution), ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ স্থাপন ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল।

৫. বাংলা সাহিত্য ও গণমাধ্যম ঃ জনগণের সুবিধার জন্য বর্ণমালার সংস্কারসাধন, বাংলা গদ্য সাহিত্য সৃষ্টি, আদর্শ পাঠ্য পুস্তক রচনা, বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ প্রভৃতি ছিল তাঁর শিক্ষা চিন্তার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। এই প্রসঙ্গে 'বর্ণপরিচয়', 'বোধদয়', 'কথামালা' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' অ্যাখ্যা দেন। বিদ্যাসাগরের সাথে তত্ত্ববোধিনী, সর্বশুভকরী, সোমপ্রকাশ, হিন্দু প্যাট্রিয়ট সংবাদপত্রগুলির গভীর যোগাযোগ ছিল।

এছাড়াও নর্মাল স্কুল স্থাপন, বিদ্যালয় পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন, সংস্কৃত-ইংরেজি-মাতৃভাষার মধ্যে সমন্বয়সাধন প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর শিক্ষাক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের কথা ব্যক্ত করে।

◆ **বর্তমান ভারতীয় সমাজে বিদ্যাসাগরের প্রাসঙ্গিকতা ঃ** বিদ্যাসাগর ও নবজাগরণের প্রায় দেড় শতাব্দী অতিক্রান্ত হলেও, আজও বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

বাংলার ঘরে ঘরে সন্তানদের হাতে খড়ি ও বাংলা বর্ণের পরিচয় ঘটে 'বর্ণপরিচয়'-এর মাধ্যমে। এছাড়া শিশু মনকে বিকশিত করতে 'কথামালা', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আজ ভারতবর্ষের অন্যতম সংকট হল নিরক্ষরতা। কিন্তু আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বিদ্যাসাগরের হাত ধরে যদি গণশিক্ষার রাস্তা সকলের জন্য না খুলে যেত, তাহলে ভারতবর্ষ আরো ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাসের জালে আবদ্ধ থাকত।

আজ শিক্ষা, কর্ম, রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে আমরা মহিলাদের সমান অংশগ্রহণ লক্ষ্য করে থাকি। এছাড়াও নারী স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন প্রভৃতি বিষয়গুলি বিদ্যাসাগরের নারীশিক্ষা প্রসারের ফলশ্রুতি।

বিদ্যাসাগর প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কথা বলেছিলেন। আজ আমরা দেখি নতুন 'জাতীয় শিক্ষা নীতিতে' সেই কথাই পুনরায় বলা হচ্ছে।

তাই বিদ্যাসাগর শিক্ষার জগতে আজও অমর ও প্রাসঙ্গিক।

(e) ভারতবর্ষে সন্ত্রাসবাদের কারণ ও তার ফলাফল সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ আলোচনা করো। (5+3)

উঃ সন্ত্রাসবাদ হল ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার ক্ষেত্রে একটি জলন্ত সমস্যা। জনগণের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী, হুমকি প্রদান থেকে প্রাণনাশ পর্যন্ত ক্রিয়াকলাপের উপাদানযুক্ত ও বিধ্বংসী কার্যকলাপের মাধ্যমে ধর্মীয়, রাজনৈতিক অথবা অন্য কোনো নীতিগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেআইনীভাবে পালিত মতাদর্শই হল সন্ত্রাসবাদ।

ভারতে এপর্যন্ত যতগুলি সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে তার দায় স্বীকার করে যে সকল সংগঠনের নাম উঠে এসেছে তার থেকে অপ্রিয় হলেও কয়েকটি সত্য পাওয়া যায়। সন্ত্রাসবাদের পিছনে কারণগুলি নিম্নরূপ—

(ক) কাশ্মীর সমস্যা সমাধান না করে, 'কাশ্মীর পাকিস্তানের অবিচ্ছেদ্য অংশ' এই ভ্রান্তিকে বাস্তবায়িত করতে না পেরে প্রতিবেশী দেশটি বারংবার তাদের আতঙ্কবাদী গোষ্ঠীকে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। মার্কিন প্রশাসনের চাপে কখনো কখনো শান্তির কথা বললেও পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীরে ঘটানো ছায়াযুদ্ধকে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে দিতে চাইছে। তাই সন্ত্রাসবাদী নেতাদের গ্রেপ্তার করে আবার সময়ের ব্যবধানে ছেড়ে দেয় যাতে আরো জঙ্গী সংগঠন তৈরী করা যায় ধর্মের দোহাই দিয়ে। এভাবে তারা নিজের দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিচ্ছে।

(খ) সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা ব্যক্তির মধ্যে রোপণের কয়েকটি নীতি হল যে আমার ঈশ্বর, ধর্ম, দেশ, সমাজ, পরিবার সবকিছু তোমার থেকে ভালো এবং আমার সবকিছু উন্নত। আর তা বোঝানোর সহজ উপায় অন্যদেশের নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা।

(গ) হিন্দু-মুসলিম উভয় মৌলবাদ সন্ত্রাস আশ্রিত। যেমন ২০১০ সালের ডিসেম্বরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের স্বামী অসীমানন্দ সহ অন্যান্য অভিযুক্তগণ বেশ কয়েকটি মামলার সাথে জড়িত থাকায় গ্রেপ্তার হন এবং স্বীকার করেছিলেন বিগত বেশ কয়েকবছর ধরে হিন্দু সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বৃহৎ হয়েছে। এক্ষেত্রে এদের সাথে সমাজসেবক, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতিবিদ–, বুদ্ধিজীবী, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রের ব্যক্তিদের যোগ পাওয়া যায়।

(ঘ) বিভিন্ন সময় বহু রাজনৈতিক দলের সাথে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল তাদের নিজ স্বার্থ সিদ্ধিতে ব্যবহার করে। যেমন– গোর্খাল্যান্ডের দাবী, মাওবাদীদের কার্যকলাপ প্রভৃতি।

(ঙ) সম্পদের অসম বণ্টন ও স্বৈরতান্ত্রিক লুটে প্রতিবাদীরাও অনেক সময় সন্ত্রাসবাদী হয়ে ওঠে। আবার সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবাদ, ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবি সন্ত্রাসবাদকে জন্ম দেয়।

(চ) অনেক সময় রাষ্ট্র তার ব্যর্থতা, অসৎ স্বার্থ ও তার কর্মফলকে লুকিয়ে রাখতে সন্ত্রাসবাদকে সবকিছুর জন্য ঢাল হিসাবে দায়ী করে। এতে রাষ্ট্রের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনসাধারণের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়।

(ছ) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সন্ত্রাসবাদীদের সাথে আপস করার ফলেও অনেক সময় সরকারকে মাসুল দিতে হয়।

◆ **ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের ফলাফল ঃ** Global Terrorism Index Report 2014 অনুযায়ী ভারত ১৬২ টি দেশের মধ্যে ৬ নম্বরে ছিল। ২০১৯ সালে ছিল ৭ নম্বরে। ২০০০ সাল থেকে প্রতিবছর ভারত GTI-তে প্রথম দশে থেকেছে। লস্কর-ই-তৈবা ও হিজাবুল মুজাহিদিন ভারতের সবথেকে ক্ষতিকারক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসাবে ২০১৪ সালে চিহ্নিত হয়েছে।

ভারতে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ক্রমশই বাড়ছে। ১৯৯৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ৫৮,২৮৮ জন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন রাজ্যপাল এম.কে. নারায়ণন ২০০৮ সালের আগস্টে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে ভারতে ৮০০ সক্রিয় সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর কথা বলেন। ২০০৮ সালের ২৬ শে নভেম্বর মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে ১০ জন পাকিস্তানি জঙ্গী হামলা চালায়, সেই ঘটনার গভীর ক্ষত আজও অক্ষত। সম্প্রতি তারা আবার পুলওয়ামায় জঙ্গী হামলা চালিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। জম্মু ও কাশ্মীরে তো প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানের নির্লজ্জ আতঙ্কবাদী হামলায় ভারতীয় জাওয়ান ও নিরীহ জনগণের নিহত হওয়ার ঘটনা দেখা যায়।

ইনস্টিটিউট অব ইকনোমিক্স অ্যাণ্ড পিস এর গবেষণা অনুযায়ী বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ সূচকে ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ভারতে বৃদ্ধির সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধির হার ৭০ শতাংশ। ভারতে সংঘটিত অধিকাংশ সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়েছে ২০১৩ সালে। যার অর্ধেক ঘটে বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ছত্তিশগড়ে। এক্ষেত্রে মাওবাদীদের ভূমিকা বেশী ছিল। অন্যদিকে, সন্ত্রাসবাদী হামলায় মোট মৃত্যুর ১৫ শতাংশই ঘটে জম্মু-কাশ্মীরে। এক্ষেত্রে তিনটি ইসলামপন্থী দলের ভূমিকা আছে। এছাড়াও ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আসাম, বোড়োল্যাণ্ড, কামতাপুর ও মেঘালয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হামলায় ১৬ শতাংশ মৃত্যু হয়েছে। ভারতে কিছু উল্লেখযোগ্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হল— ব্রহ্মপুত্র মেল ট্রেনে বিস্ফোরণ (৩০.০১.১৯৯৬), জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা আক্রমণ (০১.১০.২০০১), দিল্লীর সংসদ ভবন আক্রমণ (১৩.১২.২০০১), গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির আক্রমণ (২৪.০৯.২০০২), মুম্বাই বোমা বিস্ফোরণ (২৫.০৮.২০০৩), মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণ (১১.০৭.২০০৬), সমঝোতা এক্সপ্রেস বিস্ফোরণ (১৮.০২.২০০৭), হায়দরাবাদে লুম্বিনী পার্ক বিস্ফোরণ (২৫.০৮.২০০৭), মুম্বাই হামলা (২৬.১১.২০০৮), হায়দরাবাদ বিস্ফোরণ (২১.০২.২০১৩), পাটনা বিস্ফোরণ (২৪.১০.২০১৩), পুলওয়ামা হামলা (১৪.০২.২০১৯) প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায় সন্ত্রাসবাদীদের কোনো ধর্ম নেই, সন্ত্রাসবাদই তাদের ধর্ম। তাই হিন্দু ও মুসলিম উভয় সন্ত্রাসবাদীই ঘৃণ্য। জন্মসূত্রে যে কোনো মানুষ কোনো নির্দিষ্ট জাত ও ধর্মের হয়, কিন্তু কোনো ধর্ম বা জাত সন্ত্রাসবাদকে বৈধতা বা আশ্রয় দেয় না, নিরীহ মানুষের হত্যা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতাকেও অনুমোদন করে না।

অথবা (e)

ঋষি অরবিন্দকে অনুসরণ করে ব্যক্তিমানুষের ত্রিবিধ রূপান্তর আলোচনা করো। (8)

উঃ শ্রী অরবিন্দের মত অনুযায়ী জন্মগতভাবে মানুষ অজ্ঞ, বিভক্ত ও সংঘাতপূর্ণ সত্তা। বস্তুর অন্তর্নিহিত মৌলিক অচৈতন্যতা থেকে ব্যক্তিমানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। তাই স্বভাবতই অনেক বিষয়ই মানুষের অজানা। মানুষের সেই অজানা বিষয়গুলি শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করেছেন। এগুলি হল– বাস্তবতা (Reality)-র প্রকৃতিসহ তার উৎস ও উদ্দেশ্য, ব্যক্তিমানুষের নিজের প্রকৃতিসহ তার অংশগুলি ও তার সত্তার সংহতি, কী উদ্দেশ্য সে সাধন করে, তার ব্যক্তিগত ও আধ্যাত্মিক অন্তর্নিহিত সামর্থ্য প্রভৃতি। তাছাড়া বিভাজন ও সংঘাত-সংঘর্ষের মাধ্যমে মানুষ তার জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অন্যান্যদের সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং জীবন ও চৈতন্য সম্পর্কিত তাঁর বিভাজিত বক্তব্যও এর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রী অরবিন্দের মতানুসারে মানুষকে উপরি উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি অতিক্রম করতে হবে। তার জন্য মানুষকে আত্ম-আবিষ্কারের প্রক্রিয়ায় সামিল হতে হবে। এইভাবে মানুষ তার দিব্য প্রকৃতিকে প্রকাশ করতে পারবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ব্যক্তিকে ত্রিবিধ পদক্ষেপের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়টিকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ত্রিবিধ রূপান্তর। এই ত্রিবিধ রূপান্তর হল— (ক) আত্মাগত রূপান্তর, (খ) আধ্যাত্মিক রূপান্তর এবং (গ) অতিমানসিক রূপান্তর।

(ক) আত্মাগত রূপান্তর (Psychic Transformation)ঃ ত্রিবিধ রূপান্তরের প্রথম পর্যায়টি হল মানুষের নিজের অভ্যন্তরে সচলতা বা আত্মিক সচলতা। এই সচলতা রূপান্তর জীবনের উপরিস্তর থেকে আলাদা। এই রূপান্তর হয় জীবনের অভ্যন্তরের গভীরে। এর দ্বারা আত্মিক সত্তা আবিষ্কৃত হয়। এই অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ অভিন্নতা ও সৃষ্টির মধ্যে ঐক্য দেখতে পায় এবং জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা সমস্ত বৈপ্যরীত্যের মধ্যে সামঞ্জস্যকে খুঁজে পায়।

(খ) আধ্যাত্মিক রূপান্তর (Spiritual Transformation)ঃ আত্মিক পরিবর্তনের সুবাদে ব্যক্তির মন সম্প্রসারিত হয় এবং সে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জ্ঞানের আলোক, স্বজ্ঞা (intuition) ও উন্মোচনের মাধ্যমে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়। তার ফলে অতিমানসিক বোধশক্তির সৃষ্টি হয়। উচ্চতর অবস্থা থেকে আলো প্রবিষ্ট হয় এবং ব্যক্তির সত্তার বিভিন্ন অংশগুলির পরিবর্তন আরম্ভ হয়।

(গ) অতিমানবিক রূপান্তর (Supramental Transformation)ঃ আত্মিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তরের পর শ্রীঅরবিন্দ অতিমানসিক পরিবর্তনের কথা বলেছেন। এই অতিমানসিক পরিবর্তন হল সর্বাধিক র‍্যাডিকাল পরিবর্তন। এ হল মূলত মন, হৃদয়, আবেগ-অনুভূতি ও জড়দেহের সম্পূর্ণ রূপান্তর।

SOCIOLOGY

2015

বিভাগ -খ (40 Marks)

2) বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি লেখো **1×24=24**

(i) হিন্দু বিবাহ আইন কবে পাশ হয়?

(a) 1949 খ্রিস্টাব্দ (b) 1950 খ্রিস্টাব্দ

(c) 1955 খ্রিস্টাব্দ (d) 1951 খ্রিস্টাব্দ

উঃ (d) 1951 খ্রিস্টাব্দ

(ii) সামাজিক সমস্যাকে বলা হয়–

(a) সামাজিক উৎপাদন (b) সামাজিক সংহতি

(c) সামাজিক ব্যাধি (d) সামাজিক ব্যবস্থা

উঃ (c) সামাজিক ব্যাধি

(iii) ITDP-এর পূর্ণরূপ কী?

(a) Integrated Tribe Development Programme

(b) Integrated Tribal Development Programme

(c) Integrated Tribal Development polity

(d) Integrated Tribal Development Programme

উঃ (b) Integrated Tribal Development Programme

(iv) শহরে শ্রেণিকাঠামোর মধ্যে নিম্নে কোন শ্রেণিটি নয়?

(a) পুঁজিপতি শ্রেণি (b) কৃষক শ্রেণি

(c) পেশাভিত্তিক শ্রেণি (d) শ্রমিক শ্রেণি

উঃ (b) কৃষক শ্রেণি

(v) সংস্কৃতায়ন ধারণাটির সঙ্গে কোন ধারণাটির সম্পর্ক পাওয়া যায়?

(a) প্রাথমিক গোষ্ঠী (b) গৌণ গোষ্ঠী

(c) নজির স্থাপক গোষ্ঠী (d) এদের কোনোটিই নয়

উঃ (c) নজির স্থাপক গোষ্ঠী

(vi) পাক্কা খাবার বোঝানো হয়–

(a) সেই খাবারকে যা রন্ধন করা হয় শুদ্ধ ঘি ও বাসমতি চাল দিয়ে

(b) তরতাজা ফলাহারকে

(c) শুদ্ধ ঘি দ্বারা রন্ধন করা যে কোনো খাবারাদিকে

(d) যে সমস্ত খাবার উচ্চ জাতির জন্য শুদ্ধ ঘি দ্বারা রন্ধন করা হয়

উঃ (d) যে সমস্ত খাবার উচ্চ জাতির জন্য শুদ্ধ ঘি দ্বারা রন্ধন করা হয়

(vii) 'Electronic Money' ধারণাটি যুক্ত—

(a) বিশ্বায়নের সঙ্গে (b) দুর্নীতির সঙ্গে

(c) আইনের সঙ্গে (d) আধুনিকীকরণের সঙ্গে

উঃ (a) বিশ্বায়নের সঙ্গে

(viii) উদারনীতিকরণ কত খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছে?

(a) 1890 খ্রিস্টাব্দে (b) 1990 খ্রিস্টাব্দে

(c) 1991 খ্রিস্টাব্দে (d) 1993 খ্রিস্টাব্দে

উঃ (c) 1991 খ্রিস্টাব্দে

(ix) যজমানি ব্যবস্থার দুটি প্রধান শ্রেণি হল—

(a) শাসক শ্রেণি ও প্রজা (b) উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি

(c) যজমান ও কামিন (d) এদের কোনোটিই নয়

উঃ (c) যজমান ও কামিন

(x) ভারতে সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ প্রথম শুরু হয়—

(a) 1839 খ্রিস্টাব্দে (b) 1851 খ্রিস্টাব্দে

(c) 1962 খ্রিস্টাব্দে (d) 1920 খ্রিস্টাব্দে

উঃ (b) 1851 খ্রিস্টাব্দে

(xi) বলা যেতে পারে ভারতের সংস্কৃতি একটি—

(a) মিশ্র সংস্কৃতি (b) একক সংস্কৃতি

(c) ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি (d) কেবল ভারততাত্ত্বিক সংস্কৃতি

উঃ (a) মিশ্র সংস্কৃতি

(xii) 'আধিপত্যকারী জাতি' ধারণাটি কার ?

(a) ডি. পি. মুখার্জি (b) বিনয় কুমার সরকার

(c) এম. এন. শ্রীনিবাস (d) জি. এস. ঘুরে

উঃ (c) এম. এন. শ্রীনিবাস

(xiii) চিপকো আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন—

(a) বাবা আমতে (b) সুন্দরলাল বুহগুণা

(c) মেধা পাটেকর (d) তসলিমা নাসরিন

উঃ (b) সুন্দরলাল বুহগুণা

(xiv) অন্ত্যোদয় যোজনা হল—

(a) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি (b) নিরক্ষতা দূরীকরণ কর্মসূচি

(c) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (d) নারী স্বনির্ভর কর্মসূচি

উঃ (a) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি

(xv) 'The Life Divine' গ্রন্থটি কার রচনা ?

(a) ঋষি অরবিন্দ (b) ভিমরাও আম্বেদকর

(c) স্বামী বিকেকানন্দ (d) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উঃ (a) ঋষি অরবিন্দ

(xvi) 'মূক নায়ক' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি কে প্রকাশিত করেন ?

(a) এম. কে. গান্ধী (b) বি. আর. আম্বেদকর

(c) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (d) গোপালকৃষ্ণ গোখলে

উঃ (b) বি. আর. আম্বেদকর

(xvii) কোনটি পাশ্চাত্যকরণের সঙ্গে মিল যায় না ?

(a) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (b) আধুনিক বিজ্ঞান

(c) আধুনিক ইতিহাসের ধারণা (d) ধর্মীয় মতবাদ

উঃ (d) ধর্মীয় মতবাদ

(xviii) দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক ছিল—

(a) জাতকেন্দ্রিক (b) শ্রেণিকেন্দ্রিক

(c) কর্মকেন্দ্রিক (d) এগুলির সবকটিই ঠিক

উঃ (a) জাতকেন্দ্রিক

(xix) West Bengal Estate Acquisition Act কবে পাশ করা হয়?

(a) 1979 খ্রিস্টাব্দে (b) 1953 খ্রিস্টাব্দে

(c) 1950 খ্রিস্টাব্দে (d) 1981 খ্রিস্টাব্দে

উঃ (b) 1953 খ্রিস্টাব্দে

(xx) সমাজতত্ত্ব পড়ার অন্যতম সুবিধা হল—

(a) মৌলিকত্ব বজায় রাখা (b) আত্মবাচকতা অর্জন করা

(c) তুলনা করার ক্ষমতা না রাখা (d) জাতিভেদকে বোঝা

উঃ (d) জাতিভেদকে বোঝা

(xxi) শিল্পায়ন ও নগরায়ণ সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন করে। এগুলি হল কীসের সূচক?

(a) আধুনিকীকরণ (b) সংস্কৃতায়ন

(c) ধর্মনিরপেক্ষীকরণ (d) বিশ্বায়ন

উঃ (a) আধুনিকীকরণ

(xxii) সমাজতত্ত্ব একটি _____ সমাজবিজ্ঞান।

(a) মানবতাবাদী (b) দৃষ্টবাদমূলক

(c) দার্শনিক (d) প্রযুক্তিগত

উঃ (a) মানবতাবাদী

(xxiii) The Positive Background of Hindu Sociology– গ্রন্থটি কার লেখা?

(a) প্যাট্রিক গেডেস-এর (b) বিনয়কুমার সরকার-এর

(c) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল-এর (d) এ. আর. দেশাই-এর

উঃ (b) বিনয়কুমার সরকার-এর

(xxiv) সমাজতত্ত্বের পঠনপাঠন ভারতবর্ষে চালু হয়—

(a) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে (1919) (b) মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ে (1928)

(c) পুনে বিশ্ববিদ্যালয়ে (1949) (d) লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে (1921)

উঃ (a) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে (1919)

3) নিম্নলিখত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো। (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) 1×16=16

(i) সাম্প্রদায়িকতার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো।

উঃ (1) সাম্প্রদায়িকতা হল মতাদর্শগত একটি বিশ্বাস।

(2) এই মতাদর্শের মুখ্য উপাদান হল ধর্ম।

(ii) পরিবেশ দূষণের দুটি কারণ লেখো।

উঃ (1) আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2)।

(2) অতিরিক্ত জনসংখ্যা ও জনসংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি হার।

(iii) কর্মক্ষেত্রে নারীদের অসুবিধাগুলি কী?

উঃ কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রধান অসুবিধাগুলি হল—

(1) বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন পুরুষ সহকর্মীদের কটুক্তি বা যৌন হেনস্থা।

(2) একই সাথে সন্তান প্রতিপালন ও কর্মস্থল সামলানো।

(3) পুরুষ সহকর্মীদের আধিপত্য প্রভৃতি।

(iv) ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থায় দুটি কাঠামোগত পরিবর্তন লেখো।

উঃ (1) পরিবারগুলির Production unit বা উৎপাদনশীল একক থেকে Consumption unit বা ভোগ এককে পরিবর্তন।

(2) যৌথ পারিবারিক গঠন ভেঙে বর্তমানে সর্বত্র একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি।

(v) চরম দারিদ্র্য কী?

উঃ চরম দারিদ্রের অর্থনৈতিক ধারণা অনুযায়ী, একজন ব্যক্তি যখন তার ও তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রাথমিক দৈহিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য) পূরণে অসমর্থ হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে চরম দারিদ্র্য বলা হয়।

অথবা,

মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে কী বোঝানো হয়?

উঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে মোটামুটি শিক্ষিত, বিত্তবান না হলেও আর্থিক সামর্থে স্বচ্ছল, স্বাধীন বৃত্তিজীবী সামাজিক শ্রেণিকে বোঝায়।

(vi) ধর্ম বলতে কী বোঝানো হয়?

উঃ সাধারণভাবে, ধর্ম হল একটি আবেগ বা বিশ্বাস, যেখানে মনে করা হয়, মানবজগতের বাইরে কোনো এক অলৌকিক সর্বশক্তিমান অদৃশ্য সত্তা রয়েছে– যার ইচ্ছাতেই জাগতিক ও মহাজাগতিক সবকিছু পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এই সত্তাকে পাওয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের যাবতীয় সুখ-শান্তি বজায় থাকে।

অথবা,

সর্বোদয়-এর অর্থ কী?

উঃ 'সর্বোদয়' সমাজের কথা আমরা পাই মহাত্মা গান্ধীর ভাবনায়, যার অর্থ হল 'সকলের কল্যাণ'। গান্ধীর চোখে সর্বোদয় সমাজে সকলেই সমান, কেউ কারো দ্বারা শোষিত বা অত্যাচারিত হবে না, প্রতিষ্ঠিত থাকবে সততা, অহিংসা, ভ্রাতৃত্ববোধ।

(vii) ভারততত্ত্বের সংজ্ঞা দাও।

উঃ ভারতীয় সমাজ পর্যালোচনার ক্ষেত্রে ভারততত্ত্ব হল একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, যেখানে ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজব্যবস্থা ও তার উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করা হয়। এককথায় ভারত ও ভারতের সংস্কৃতির অধ্যয়ন, অনুশীলনই হল ভারততত্ত্ব।

অথবা,

নিম্নবর্গীদের দৃষ্টিভঙ্গি কাকে বলে?

উঃ যে দৃষ্টিভঙ্গিতে সামাজিক প্রশাসনিক ক্ষমতাবানদের আধিপত্যাধীন পুঁজিবাদী যন্ত্র সভ্যতার নীচে চাপা পড়া বিস্মৃত, অবহেলিত নিম্নবর্গের মানুষদের জীবন যন্ত্রণা, নিপীড়ন, বঞ্চনা, চেতনা, মানসিকতার নানা বৈশিষ্ট্য, তাদের বিবর্তন প্রভৃতি তাদের মতো করে (History told from below) বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে নিম্নবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গি বলা হয়।

(viii) দৃষ্টবাদী ধারণার সঙ্গে যুক্ত দুজন চিন্তাবিদের নাম লেখো।

উঃ দৃষ্টবাদী ধারণার সাথে যুক্ত দুজন চিন্তাবিদের নাম হল— স্যামুয়েল লব ও রাধাকমল ভট্টাচার্য।

অথবা

রোমিলা থাপার রচিত একটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উঃ রোমিলা থাপার রচিত একটি গ্রন্থের নাম হল– Ancient Indian Social History।

(ix) গণমাধ্যমের একটি সুবিধা ও অসুবিধা লেখো।

উঃ গণমাধ্যমের একটি সুবিধা হল– এটি সমাজ সচেতকের ভূমিকা পালন করে।

গণমাধ্যমের একটি অসুবিধা হল– এর নিরপেক্ষতার অভাব মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে বিভ্রান্ত করে।

(x) সামাজিক অসুবিধা বলতে কী বোঝায়?

উঃ প্রতিটি সমাজেরই একটি অভিপ্রেত বা কাম্য স্বাভাবিক অবস্থা থাকে। কোনো বিষয় যখন সেই স্বাভাবিক অবস্থাটিকে বিনষ্ট করে, তাকে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক করে তোলে তখন তাকেই বলা হয় সামাজিক অসুবিধা।

(xi) রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার দুটি লক্ষ্য কী কী?

উঃ রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার দুটি লক্ষ্য হল– (1) শিক্ষার্থীর সামাজিক গুণাবলীর বিকাশ এবং (2) বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলা।

(xii) দারিদ্র্যের দুটি কারণ লেখো।

উঃ দারিদ্র্যের দুটি কারণ হল– ব্যক্তির ঋণগ্রস্থতা এবং অপর্যাপ্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

(xiii) সংস্কৃতায়ন বলতে কী বোঝানো হয়?

উঃ যে উপায় বা পদ্ধতিতে একটি নিম্নস্তরের হিন্দু জাতি, উপজাতি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী, কোনো উচ্চ জাতি বা দ্বিজ জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অনুসরণে নিজের রীতিনীতি, আদর্শ, প্রথা এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে, তাকেই বলে সংস্কৃতায়ন।

অথবা,

জাতি ব্যবস্থা বলতে কী বোঝো?

উঃ ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গকে তাদের জন্মসূত্রে এবং নির্ধারিত কর্মের ভিত্তিতে বিশেষীকৃত কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভাজন করার সুপ্রাচীন ব্যবস্থাটি হল জাতি ব্যবস্থা।

(xiv) শিক্ষা বলতে কী বোঝো?

উঃ শিক্ষা হল সারাজীবন ধরে চলা এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি তার জীবন ও চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে প্রযোজনীয় তথ্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্ব গঠন করে ও সামাজিক হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা হয়, শিক্ষা হল মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার প্রকাশ।

অথবা

কত খ্রিস্টাব্দে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বেথুন সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

(xv) 'The Republic' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উঃ 'The Republic' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন– প্লেটো।

অথবা

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি কী নিয়ে আলোচনা করে?

উঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি কোনো সমাজের সামাজিক বিষয়াদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে ওই সকল উপাদানের অতীত উৎস সন্ধান করে থাকে। সমাজের কাঠামো, সমাজের বিবর্তন, ইতিবৃত্ত, প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক প্রভৃতি যা সম্পূর্ণ করে সমাজবৃত্তকে সেই সবই এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচিত হয়।

(xvi) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার দুটি কারণ লেখো।

উঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য ব্যবস্থা ভেঙে যাওয়ার দুটি কারণ হল– ধনতন্ত্রের উদ্ভব এবং জমির গ্রামভিত্তিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব।

অথবা

যজমানি ব্যবস্থার দুটি সুবিধা লেখো।

উঃ যজমানি ব্যবস্থার দুটি সুবিধা হল–

(a) এই ব্যবস্থার ব্যাপকতা সামাজিক ঐক্য স্থাপনে সহায়ক ছিল,

(b) এটি বংশপরম্পরায় প্রবাহিত থাকায় উভয়েরই কাছে এ ছিল অর্থনৈতিক নিশ্চিত নিরাপত্তার বিষয়।

SOCIOLOGY

2016

বিভাগ -ক

1. (a) ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়? এ বিষয়ে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। (3+5)

উঃ উল্লিখিত প্রশ্নের মডেল উত্তরের জন্য 2019 সালের (1.a) দ্রষ্টব্য।

অথবা,

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূলকথা কী? এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তক ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের অবদান আলোচনা কর। (3+5)

উঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ

সমাজতাত্ত্বিকেরা নানা আঙ্গিকে 'সমাজ'-কে অনুধাবনের চেষ্টা করেন। সমাজ বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি বা আঙ্গিক থেকে অন্য আঙ্গিক পৃথক হলেও তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না; এইরকমভাবে সমাজকে অধ্যয়ন বা তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল কথা হল—ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের নিরিখে 'সমাজ'-কে, নানা সমাজিক সম্পর্ককে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও তাদের আন্তঃক্রিয়াকে অনুধাবন করতে চাওয়া। সমাজতত্ত্ব একটি গতিশীল বিষয় যা মনে করে সভ্যতার শুরু থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত মানবসমাজ বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় সাম্প্রতিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। অর্থাৎ, বর্তমানে প্রত্যেক সমাজকে আমরা যে রূপে দেখতে পাই তার একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আছে। মানবসমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল কারণ সকল সামাজিক গোষ্ঠী, সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার অংশীদার। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রকৃতপক্ষে সমাজ পরিবর্তনের ধারাটি বিশ্লেষণ করতে আগ্রহী হয়ে থাকেন। প্রতিটি সমাজের কাঠামো, রীতিনীতি, সংস্কৃতি এমনকি তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে জানতে গেলেও আসলে সমাজব্যবস্থার উৎস বা শিকড়ের সন্ধান করতে হয়। সেখানেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির সার্থকতা।

♦ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের অবদান

ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ ইউরোপীয় 'মডেল' থেকে একেবারেই ভিন্ন। তাই ভারতীয় সমাজের ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই অন্য সমাজের ইতিহাসের তুলনায় স্বতন্ত্র। তাই সমাজতাত্ত্বিকেরা এই স্বকীয়তার কথা স্মরণ করেই ভারতীয় সমাজকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জার্মান দার্শনিক কার্ল মার্কস তাঁর 'The Asiatic Mode of Production' গ্রন্থে ভারতীয় সমাজের এই স্বতন্ত্র দিকটির প্রতি আলোকপাত করেছেন।

ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকেরা প্রায় শুরুর সময় থেকেই সমাজ বিশ্লেষণের জন্য 'ঐতিহাসিক আঙ্গিক'-এর আশ্রয় নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রাধাকমল মুখার্জী, জি. এস. ঘ্যুরে, ধূর্জটি প্রসাদ মুখার্জী, এ. আর. দেশাই, এস.সি. দুবে—প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকের নাম উল্লেখ করা যায়। তবে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এঁনারা কেউ ঘোষিতভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা নন; এমনকি এঁদের অনেকেই দ্বন্দ্বমূলক বা কার্যকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গির আঙ্গিকে সমাজ বিশ্লেষণ করলেও ইতিহাসের উপাদানের নিরিখে তাঁরা ভারতীয় সমাজ সভ্যতাকে অনুধাবন করেছেন। তাই ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তা হিসাবে এঁরাই পাথেয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে বিচার করলে ভারতের সমাজ বিবর্তনের ধারাটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য বর্ণভেদ ও জাতি ব্যবস্থা, ভারতীয় সনাতনী পরিবার প্রথা, ধর্মীয় রীতিনীতি, গ্রাম-সমাজ, শ্রেণিবিন্যাস—ইত্যাদি বিষয়গুলি মূল উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। উল্লিখিত সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও রচনা সম্পাদন করেছেন। এছাড়া, বিশেষভাবে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা, গ্রামীণ অর্থনীতি, ব্রিটিশ পূর্ববর্তী ভারতীয় সমাজ, ব্রিটিশ শাসনকালে এর নানা পরিবর্তন, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ, নগরায়ন, শিল্পায়ন, আধুনিকতা—প্রভৃতি বিষয়গুলিও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যথেষ্ট গুরুত্ব নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকদের যে সকল কাজ বা গ্রন্থাবলী এক্ষেত্রে প্রামাণ্য বিষয় বলে মনে করা হয়, সেগুলি হল—

১. The Rural Economy of India (1926)—রাধাকমল মুখার্জী

২. Indian Working Class (1945)—রাধাকমল মুখার্জী

৩. Caste and Race in India (1932)—জি .এস. ঘ্যুরে

৪. The Social Background of Indian Nationalism (1959)—এ. আর. দেশাই

৫. Indian Society (1990)—এস. সি. দুবে

৬. Indian Village (1955)—এস. সি. দুবে

৭. Rural Sociology in India (1969)—এ. আর. দেশাই

(b) স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। 'যজমানি ব্যবস্থার ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো। (5+3)

উ: 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজ' প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থনীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 'স্বয়ংসম্পূর্ণ'- কথাটির সাধারণ অর্থ হল — যে নিজেই নিজের সকল চাহিদা মেটাতে পারে। অর্থাৎ, কোনও গ্রাম যখন নিজের সমষ্টিগত চাহিদা নিজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

অংশগ্রহণ করে মিটিয়ে নিতে পারে, চাহিদা পূরণের জন্য গ্রামের বাইরে বিশেষ নির্ভর করতে হয় না — তখন তাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমাজ বলা হয়। এই ব্যবস্থা প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে দেখা গেলেও ব্রিটিশদের আগমন ও তৎপরবর্তী আধুনিকীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ, পাশ্চাত্যায়ণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাবে এই ব্যবস্থার পতন হয়েছে।

- **স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের বৈশিষ্ট্য ঃ**

১. স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামসমাজ প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতীয় সমাজকে নির্দেশ করে।

২. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের প্রধান অর্থনৈতিক জীবিকা ছিল কৃষি।

৩. এই সময় কৃষিজমির কোনো ব্যক্তি মালিকানা ছিল না; কৃষিজমি তখন যৌথ মালিকানাভুক্ত বিষয় ছিল।

৪. জমি সংক্রান্ত নানা বিষয়, যেমন—জমি বিতরণ, রাজস্ব সংগ্রহ বা জমি সংরক্ষণ — ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'জমি পঞ্চায়েত' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো।

৫. এই সমাজব্যবস্থার আরও একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল—বাজারবিহীন অর্থনীতি। এই সময় প্রধানত বিনিময় প্রথার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী যোগানের ব্যবস্থা করা হতো। গ্রামের কোনো নির্দিষ্ট জায়গায়, সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে আদান-প্রদানের কথাও জানতে পারা যায়। এই ব্যবস্থাই পরবর্তীতে 'হাট' হিসাবে বিকাশ লাভ করে।

৬. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল— 'যজমানি প্রথা'। (পরে এ বিষয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে)

৭. এই সময় গ্রামজীবনে 'জাতিভেদ' ব্যবস্থার সক্রিয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতিভেদের সাথে পেশাভিত্তিক নিযুক্তির একটা বংশানুক্রমিক সম্পর্ক ছিল।

৮. কৃষিকাজ ছাড়াও ওই সময়ে 'কৃষি সহায়ক' নানা ক্ষুদ্র শিল্পের (যেমন—কামার, কুমোর, ছুতোর প্রমুখ) সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

৯. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজে সকল মানুষের মধ্যে এক গভীর ঐক্য ও সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়; যাকে পণ্ডিতেরা বলেছেন—''আমরা-বোধ'' (We-Feeling)

১০. বিনিময় প্রথা-র মাধ্যমে মূলত লেনদেন হতো; তাই এই সময় মুদ্রাব্যবস্থা বা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার কোনও অস্তিত্ব ছিল না।

- **ভারতবর্ষে 'যজমানি-প্রথা' ঃ**

প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখার পিছনে যজমানি প্রথা-র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সহজ কথায় বললে গ্রামের বিভিন্ন পরিবারগুলির মধ্যে পারস্পরিক নানা দ্রব্য বা পরিষেবা বিনিময় ব্যবস্থাই 'যজমানি প্রথা' নামে পরিচিত। তবে জাতব্যবস্থা ছিল এর ভিত্তি।

সংকীর্ণ অর্থে 'যজমানি' (এটি একটি বৈদিক শব্দ) কথার অর্থ পৌরহিত্য করা (পূজোর কোনও কাজ নিষ্পন্ন করা) বোঝালেও, বৃহত্তর অর্থে 'যজমানি' শব্দের অর্থ হল—'পৃষ্ঠপোষকতা'- অর্থাৎ একে অন্যকে সাহায্য করা। গ্রামসমাজে যজমানি প্রথায় দুটি গোষ্ঠী লক্ষ্য করা যায়। 'যজমান' (যাঁরা দ্রব্য বা সেবা গ্রহণ করছে) এবং 'কামিন' (যাঁরা দ্রব্য বা সেবা প্রদান করছে)। গ্রামসমাজে বিভিন্ন পরিবার পেশাগতভাবে এবং বংশানুক্রমে এইভাবে দ্রব্য ও সেবা আদান প্রদান করতো। পরিষেবা প্রদানের বিনিময়ে কামিনরা কখনও দ্রব্যে বা নগদ টাকায় পারিশ্রমিক পেতেন। তবে এই দেওয়া নেওয়ার সম্পর্ক অনেকটাই আলাপ অলোচনা বা মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী হতো।

অধ্যাপক উইলিয়াম এইচ. ওয়াইজারের The Indian Jajmani System গ্রন্থ থেকে এবিষয়ে বিশদে জানা যায়।

যজমানি ব্যবস্থায় যজমান ও কামিন গোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিক ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে উঠলেও অনেক ক্ষেত্রে কামিনদের বঞ্চনার নানা উদাহরণ দেখা গেছে। পেশার সাথে জাতব্যবস্থা জড়িয়ে থাকায় সামাজিক সচলতার অবকাশ তেমন ছিল না। ব্রিটিশ আমলে ক্রমে এই ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

(c) শিক্ষা বলতে কী বোঝ? শিক্ষার কার্যাবলি আলোচনা কর ঃ

উ: 'শিক্ষা' (education) আজ সমাজ গড়ে তোলার প্রথম সোপান, মানবজীবনের সাথে সম্পৃক্ত একটি ব্যবস্থা। বুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে সংস্কৃত 'শাস্' ধাতু থেকে শিক্ষা শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হল শাসন বা নিয়ন্ত্রণ করা। অপরপক্ষে 'বিদ্যা' কথাটি এসেছে 'বিদ্' ধাতু থেকে যার অর্থ জ্ঞান অর্জন করা। 'শিক্ষা বা বিদ্যা'র ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'Education' যার উৎপত্তি হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'Educare'—যার মানে দাঁড়ায় প্রতিপালন করা। সুতরাং, বুৎপত্তিগত বিচারে 'শিক্ষা' হল মানুষকে প্রতিপালন করা বা বৃহত্তর অর্থে জ্ঞানার্জনের নিরিখে সুশাসনের প্রতিফলনে সমাজে ব্যবহারিক আদান-প্রদানের উপযোগী করে তোলা।

এছাড়াও, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে 'শিক্ষা' শব্দটির সংকীর্ণ অর্থে এবং ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ হতে দেখা যায়। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বিদ্যালয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বোঝায়; অন্যদিকে বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা সামগ্রিক জীবনধারার সাথে সংযুক্ত জ্ঞান-কে প্রতিফলিত করে। বৃহত্তর অর্থে শিক্ষা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সাথে সংযুক্ত। তবে বিভিন্ন সময়ে সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সমাজ-কে যেভাবে দেখতে শিখিয়েছে তাতে কার্যকাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি যেমন সামাজিকীকরণের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে শিক্ষার কার্যকারিকতার কথা স্বীকার করেছে, তেমনই মার্কসীয় 'দৃষ্টিভঙ্গি' অনুসারে শিক্ষা হল শ্রেণিশোষণের হাতিয়ার—সমাজের ক্ষমতাশালী শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে শিক্ষাকে ব্যবহার করে। এছাড়া ভারতীয় চিন্তাবিদদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এঁনারা শিক্ষাকে জীবনধারণের প্রতিটি স্তরের সাথে সম্পৃক্তভাবে দেখার কথা বলেছেন।

- **শিক্ষার কার্যাবলি ঃ**

১) **সামাজিকীকরণ** - শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণের জন্য গড়ে তোলা। এই বৃহত্তর সমাজে অংশগ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃতি, মূল্যবোধসহ জীবনের মৌলিক দিকগুলি সম্পর্কেও ধারণা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে প্রথমে পরিবার ও পরবর্তীতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষা প্রদান করে। তাছাড়াও, মানুষের জীবন-ই প্রকৃতপক্ষে তার সবথেকে বড় শিক্ষক যা প্রতিনিয়ত চলার পথের নানা পাঠ দেয়।

২) **সংস্কৃতির প্রবাহমানতা বজায় রাখা** - মানুষের সাথে মানুষের আদান-প্রদান প্রকারান্তরে নানা রীতি-নীতি ও সংস্কৃতির জন্ম দেয়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন ভাষা-র উৎপত্তির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। মনের ভাব ব্যক্ত করার পাশাপাশি ভাষা সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে মানুষ তার পরবর্তী প্রজন্মকে নানা ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক জ্ঞান প্রদান করে। এইভাবে একদিকে যেমন ভাষা বা সংস্কৃতির বিবর্তনও হয় তেমনই সার্বিক অর্থে সংস্কৃতির প্রবাহমানতাও বজায় থাকে। গতিশীল মানবজীবনের এ এক অপরিহার্য অঙ্গ।

৩) **সামগ্রিকতা বোধের জন্ম বা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে সংযুক্তির পাঠ** - প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে উপলব্ধি করায় যে সমগ্র বিশ্বের সাথে তার সংযোগ কোথায়। সে কেবল সংকীর্ণ অর্থে কেবল একটিমাত্র পরিবার বা কোনও এক দেশের নাগরিক শুধু নয়— সে এই বিশ্বপ্রকৃতির অংশবিশেষ শিক্ষার কারণেই মানুষ এই সামগ্রিকতায় নিজেকে দেখতে শেখে।

৪) **আত্মচেতনা, আত্মোপলব্ধি** - বিবেকানন্দ যেমন শিক্ষা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান—শিক্ষা সেই পূর্ণতারই প্রকাশ ঘটায়। সুতরাং, প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে নিজেকে চিনতে শেখায়; আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানুষ তার নিজের সংকীর্ণতা বা মহানুভবতা অনুভব করে নিজেকে গঠনের প্রক্রিয়া নিতে পারে।

এছাড়াও সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা–

৫) বৃত্তি/পেশা গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে তুলতে আজকের দিনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বর্তমানে তত্ত্বগত (theoritical) শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি বা প্রয়োগমূলক (technical or applied) শিক্ষাও বিশেষ উপযোগী হয়ে উঠেছে।

৬) আজকের যুগে শিক্ষিত নাগরিক কোনও দেশের 'মানব সম্পদ' (Human resource) হিসাবে গণ্য হয়। শিক্ষার দিক থেকে যে সমাজ যত উন্নত, বাস্তবিক অর্থে বিশ্ব ব্যবস্থায় সেই দেশের অনন্য কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

৭) শিক্ষা মানুষকে রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করে তোলে। নিজ পারিপার্শ্বিক, নিজের দেশ তো বটেই আন্তর্জাতিক মহলেও কী ঘটে চলেছে এবং তার সাথে জীবনের যোগ কোথায়—শিক্ষা সেই ধারণা দেয়।

৮) শিক্ষা সমাজনিয়ন্ত্রণের কাজও করে। ভালো-মন্দের প্রাথমিক পাঠদান করে একদিকে যেমন সচেতনতা গড়ে তোলা যায়, তেমনই শিক্ষিত ব্যক্তির কর্মসংস্থান হলে সে প্রগতির কারিগর হয়; নতুবা সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিভেদ বাড়তে থাকে। তাছাড়া, যুগে যুগে ক্ষমতাবান শ্রেণি শিক্ষাকে নিজের প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে।

৯) সর্বোপরি বলা যায় প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মন থেকে বৈষম্য ও ভেদাভেদের অন্ধকারকে দূর করে। এই বিশ্বপ্রাণ প্রকৃতির সকলেই সমান অংশ—এই উপলব্ধি গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

(d) ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার কারণসমূহ আলোচনা কর। ভারত থেকে সাম্প্রদায়িকতার কারণসমূহ দূরীকরণে তোমার মতামত লেখ। (5+3)

উ: সাম্প্রদায়িকতা হল একটি বিশেষ মনোভাব বা বিশ্বাস। এই মনোভাব বা বিশ্বাসের সাথে মানবগোষ্ঠীর ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িত থাকে। ঐতিহাসিক বিপানচন্দ্র তাঁর 'Communalism in India' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে সাম্প্রদায়িকতা হল আসলে এক অতিরঞ্জিত বিশ্বাস যা প্রতিষ্ঠা করতে চায় যে মানুষের সাথে মানুষের প্রকৃত পার্থক্য নির্দেশ করে তার ধর্ম এবং এই ধর্মীয় পার্থক্যই হল সর্বাপেক্ষা মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই অতিরঞ্জনে বিশ্বাস করে উগ্র মৌলবাদী ভাবধারার শিকার হয়ে দেখা যায় কোনও এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায় অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক; রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষতিসাধন করে নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অতি সরলীকরণ করলে বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতা হল চরমভাবাপন্ন এবং অসহিষ্ণু মনোভাবের বশবর্তী হয়ে এক ধর্মীয় সম্প্রদায় কর্তৃক অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধন করা।

- **ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার কারণসমূহ ঃ**

প্রাচীন ভারতীয় সমাজ অধ্যয়ন করতে গিয়ে ঐতিহাসিক **ভিনসেন্ট স্মিথ** ভারতবর্ষকে 'নৃতত্ত্বের যাদুঘর' বলে অভিহিত করেছিলেন কারণ তিনি প্রাচীন ভারতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যপূর্ণ সহাবস্থানকে নির্দেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনাধীন সময় থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতবিরোধ ও অশান্তি এবং ক্রমে সাম্প্রদায়িকতার যে বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, স্বাধীনতা পরবর্তী বছরগুলিতে তা এক বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিকরা এর নানা কারণ আলোচনা করেছেন—

১. **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট** - ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচার করলে দেখা যাবে সাম্প্রদায়িকতা আসলে ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতায়

টিকে থাকার জন্য ব্যবহৃত এক 'রাজনৈতিক হাতিয়ার'। এর মূলে আছে ব্রিটিশ শাসকদের 'বিভাজন ও শাসন নীতি' (Divide and Rule Policy)। ভারতবর্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশের দুই প্রধান ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' নীতি। শাসন কায়েমের এই নীতি পুরোপুরি সফল না হলেও দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে যা পরবর্তীকালে 'দ্বিজাতিতত্ত্ব' এবং 'পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবী'র মাধ্যমে চরম আকার ধারণ করে।

২. **রাজনৈতিক কারণ** - স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র অনেক পরে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' কে সংবিধানে স্বীকৃতি দিলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মীয় ভাবাবেগকে নেতিবাচকভাবে কাজে লাগিয়েছে যা থেকে সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় পেয়েছে।

৩. **ধর্মান্তরকরণ** - ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস যেমন অনার্যদের জোর করে খ্রীষ্টান ধর্মে বা দরিদ্র দলিত বা হরিজনদের নানা লোভ দেখিয়ে মুসলিম ধর্মে রূপান্তরকরণের কথা বলে, তেমন সাম্প্রতিক ভারতে দলিত-আদিবাসী জনজাতিকে এমনকি দরিদ্র মুসলিমদের ভয় দেখিয়ে হিন্দুধর্মে রূপান্তর করার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে, এর সামাজিক পরিচিতি হল 'ঘর-ওয়াপসি' অর্থাৎ 'ঘরে ফিরে আসা'।

৪. **অর্থনৈতিক তোষণ নীতি** - ব্রিটিশ শাসনের সময় থেকে দেখা যায় বিভেদনীতিকে কার্যকরী করার স্বার্থে হিন্দুদের জন্য নানা অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা করে দেওয়া হলেও মুসলমানরা বঞ্চিত থাকেন। আবার, বর্তমানে 'পিছিয়ে থাকা শ্রেণি' (Backward Class) হিসেবে পরিচিত হয়ে নানা ধর্মসম্প্রদায় থেকে সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা পায় তা অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে।

৫. **বঞ্চনা, উদাসীনতা ও দূরভীসন্ধি** - শাসকদল নিজ স্বার্থ কায়েম করার জন্য শিক্ষা বা অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রগুলি থেকে নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে বঞ্চিত রাখে। দীর্ঘদিনের এই উদাসীনতা আসলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব টিকিয়ে রাখার কৌশলমাত্র।

- **ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ ঃ**

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিশেষত ৯০ দশকের সময় থেকে ভারতে সাম্প্রদায়িকতা যে জায়গায় পৌঁছে গেছে তার পিছনে অশিক্ষা, অন্ধবিশ্বাস ও মৌলবাদী ধ্যান ধারণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-কে সংবিধানে স্থান দিলেও বাস্তবজীবনে ভারত রাষ্ট্র কখনও ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করতে চায়নি। তাই কার্য-কাঠামোগত পরিকল্পনা হিসাবে সর্বপ্রথম নির্বাচনে ধর্ম বা ধর্মীয় বিষয়কে হাতিয়ার করে প্রচারকার্য চালানো যাবে না— এবিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। আর শুধু আইন তৈরি করলেই তো হয় না, প্রকৃত অর্থে সেই আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে হবে।

অন্ধবিশ্বাস ও মৌলবাদী ধ্যানধারণার অবসান করার লক্ষ্যে যুক্তিসম্মত তথা বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষাব্যবস্থা দেশের প্রতিটি প্রান্ত অবধি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেখা যায় প্রত্যেক শাসকদল শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করে। এ বিষয়ে জনগণকে আরও সচেতন হতে হবে।

শিক্ষিত সমাজ বা সুধী সমাজ (Civil Society)কে আরও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে।

বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা আসলে যুব সম্প্রদায়কে নানা কুকর্মে প্রবৃত্ত করে—রাজনৈতিক দলগুলি এদের কাজে লাগায় ও সাম্প্রদায়িক হিংসা ছড়ায়। এই সমস্যা দূর করতে সকলের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তার বাস্তবিক অর্থে সংস্থান করতে হবে।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলি সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারলে অন্তত কিছুটা হলেও সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘকে কাটানো সম্ভব হতে পারে।

অথবা

(d) জনবিস্ফোরণ বলতে কী বোঝ? ভারতে জনবিস্ফোরণের ফলাফল আলোচনা কর।

উ: 'জনবিস্ফোরণ' শব্দটি জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত একটি নেতিবাচক ধারণা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কোনও দেশের জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার (জনসংখ্যা হল - কোনও একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলে নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বসবাসকারী জনগণ) যদি সেই দেশের 'উন্নতি' ও 'প্রগতির' পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন জনসংখ্যাবৃদ্ধির সেই নেতিবাচক প্রভাবকে জনবিদ্যা (demography) বা সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় 'জনবিস্ফোরণ' (Population explosion) বলে।

কোনও দেশের জনসংখ্যা প্রকৃত অর্থে সেই দেশের মানবসম্পদ (human resource) হিসাবে গণ্য হয়। এই মানবসম্পদ হল দেশের মানুষ তথা জনগনের গুণগত মান যা জনসংখ্যার গড় বয়স, পুষ্টি, শিক্ষা, আয়, কর্মদক্ষতা—ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে। দেশের পরিকাঠামো যত উন্নত হয় ততই জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে জনসম্পদে পরিণত হয়। কিন্তু কোনও অবস্থায় যদি একটি দেশের জনসংখ্যা এমন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যা ওই দেশটির বেহাল পরিকাঠামোগত ত্রুটিকে ব্যক্ত করে; যার ফলে যখন গণ-দারিদ্র্য, গণ-বেকারত্ব, অপুষ্টি বা বাসস্থানের সংকুলানের মতো সামাজিক সমস্যা দেখা যায় তখন বলা যেতে পারে যে ওই দেশে জনবিস্ফোরণ ঘটেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ২০০১ সালে ভারতের জনসংখ্যা যেখানে ছিল ১০০ কোটির ঘরে সেখানে ২০১১ সালে তা ১২১ কোটিতে পৌঁছায় এবং বর্তমানে অর্থাৎ ২০২০ সালে তা প্রায় ১৪০ কোটি ছুঁতে চলেছে। প্রতি দশ বছরে গড়ে এদেশে ২০কোটি জনসংখ্যা বাড়ছে; এর ফলে ভারতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অস্বাস্থ্য-অপুষ্টি, অশিক্ষা এক ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ভারতবর্ষ আজ 'জনবিস্ফোরণে'র সমস্যায় আক্রান্ত।

- **ভারতবর্ষে জনবিস্ফোরণের ফলাফল ঃ**

জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি অনুন্নয়নের কারণ না ফলাফল সে বিষয়ে বির্তকের অবকাশ থাকলেও ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে জনবিস্ফোরণ ঘটেছে এবং সমাজের নানা স্তরে এর নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

১. **দারিদ্র্যের হার বৃদ্ধি** - ২০১০-১১ সালে যেখানে ভারতীয় জনসংখ্যার প্রায় ২২ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করতো সেখানে দেখা যাচ্ছে ২০১৯-২০সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। অর্থাৎ আজকের ১৩৫ কোটি (২০১৮ সাল) জনসংখ্যার মধ্যে ৪০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যে ডুবে আছেন। এই বিপুল জনসংখ্যা আরও যত বৃদ্ধি পাবে সমস্যা ততই আরও গভীরে যাবে।

২. **বেকারত্ব** - ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যার নিরিখে বেকারত্বের বৃদ্ধিও খুবই উদ্বেগজনক। ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (ILO) প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে বর্তমান ভারতে যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে (১৫-২৪ বছর বয়স) বেকারত্বের হার প্রায় ২৩.৩৪ শতাংশ। শিক্ষিত, কর্মক্ষম এমন মানুষদের কর্মহীনতা দেশজুড়ে হতাশা ডেকে আনছে। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে এই বিপুল বেকার ও দরিদ্র যুবসম্প্রদায় অবশ্যম্ভাবীরূপে নানা অন্ধকার জগতের কাজের সাথেও জড়িয়ে পড়ছে।

৩. **অপুষ্টি** - এই বিপুল জনসংখ্যার একটা বড় অংশ দরিদ্র এবং আয়বিহীন। ফলে দেশের জনসংখ্যার একটা বড় অংশ, বিশেষত শিশুরা অপুষ্টির শিকার। এই অপুষ্টিই আবার ডেকে আনে অযাচিত মৃত্যু। ফলে মানবসম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪. **অশিক্ষা** - ভারতের জনগণনা পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রায় ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামে বসবাস করেন। সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এমনকি শহরে দিনমজুর, ফুটপাথবাসী বা বস্তি অঞ্চলের অনেকেই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থেকে গেছেন। শিক্ষা রোজগারের উপায় তো বটেই, তাছাড়া একটা পরিমাণ শিক্ষার আলো পেলে ভালো-মন্দের একটা ধারণা তৈরি হয়। অথচ এত বড় জনসংখ্যার বেশিরভাগ অংশ পরিবার পরিকল্পনা কী তা জানেন না। দরিদ্র পরিবারে অধিক সন্তান কেন কাম্য নয় সেকথাও অনেকেই বুঝতে পারেন না। ফলে অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার হার খুব কমে নি।

৫. **মানব উন্নয়ন হ্রাস** - বর্তমানে কোনও একটি দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয় এবং সর্বোপরি জন্মের সময় গড় আয়ু (Life expectancy at birth)—এই মাপকাঠি অনুযায়ী কতটা উন্নতি করতে পেরেছে তা বোঝার জন্য HDI (Human Development Index)- যাকে বলা হয় 'মানবউন্নয়ন সূচক' তা ব্যবহার করে। আর্ন্তজাতিক স্তরে স্বীকৃত এই সূচক অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী ১৮৯ দেশের মধ্যে ভারত ১২৯তম স্থানে রয়েছে (২০২০ সাল)। সুতরাং জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা

সত্ত্বেও HDI- এর নিরিখে ১২৯তম স্থানে থাকা জনবিস্ফোরণের নেতিবাচক দিকটিকেই চিহ্নিত করছে।

ভারতবর্ষ একটি উন্নয়নশীল দেশ। খাদ্য উৎপাদন ও মাথাপিছু আয় কিছুটা স্থিতিশীল হলেও পরিকল্পনাহীন বিপুল হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অগ্রগতির পথে প্রকৃতপক্ষে অন্তরায়।

(e) **ধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।** **8**

উ: ভারতবর্ষের দার্শনিক জগতে স্বামী বিবেকানন্দ এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিবেকানন্দের ধর্মবোধ আসলে এক জীবন আদর্শ। ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝতে হলে আসলে স্বামীজির জীবনদর্শন সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ ধর্মকে জীবনদর্শনের সাথে জুড়ে নিয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারক হিসাবে বিবেকানন্দ যখন কাজ করছেন, তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। সেই পরাধীন ভারত তখন ইউরোপের কাছে 'অন্ধকারাছন্ন', 'পিছিয়ে পড়া'—এক দেশ। তাছাড়া ইংরাজ শাসনের করাল গ্রাসের কবলে পড়ে তখন সমগ্র ভারতবাসী নিজেদের গৌরবান্বিত অতীত ও ঐতিহ্য প্রায় বিস্মৃত হতে বসেছে। পরধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব ভারতবাসীকে ক্রমশ গ্রাস করছে। এইসময় ভারতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় স্বামীজি আর্বিভূত হলেন এবং ধর্মকে জাতি গঠনের আদর্শের সাথে, সর্বোপরি আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার পথ হিসাবে নির্দেশ করলেন। তিনি বলেছিলেন, ''মানুষ গড়াই আমার লক্ষ্য'' (''man making is my mission'')

ধর্মের আদর্শনৈতিক ভিত্তি হিসাবে বিবেকানন্দ বেদান্ত অনুসরণ করেছিলেন। বেদান্তের মূল শিক্ষা হিসাবে বলা যায়—প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর অভিব্যক্ত আছেন। তাই মানুষকে পূজা করাই আসলে দেবতাকে পূজা করা। বেদান্তের এই দর্শনকে পাথেয় করেই স্বামীজির বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যায়, ''জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর'' অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক জীবের মধ্যেই দেবত্ব রয়েছে—সেই জন্য মানুষের সেবা, আর্তের সেবা বা পীড়িতের সেবার মাধ্যমেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যায়।

স্বামীজির কাছে ধর্ম হল আত্ম-উপলব্ধির বিষয়—কোনও তত্ত্ব, নীতিকথা বা উপদেশ নয়। বিবেকানন্দ তাঁর ধর্মচিন্তাকে রূপদান করার জন্য বলেছেন, প্রতি মানুষের মধ্যেই দেবত্ব বিরাজমান; মানুষকে তার দেবত্ব সম্পর্কে অবগত করাই হল ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাঁর অভিমত অনুযায়ী ধর্ম হল এমন এক আচরণ বা আদর্শ যার অনুসরণ পশুবৎ ব্যক্তিকে মানুষে পরিণত করে আর মানুষকে তার স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করে দেবত্বে উন্নীত করে।

বিবেকানন্দ মনুষ্যত্বকে দেবত্বে উন্নীত করার জন্য যে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন তাকে 'যোগ' বলা হয়। এই যোগ শব্দের মর্মার্থ হল—যুক্ত করে নেওয়া। যোগ হল সেই ধর্ম যা মানুষকে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত করায়। এই যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিবেকানন্দ চারটি 'যোগ'-এ ভাগ করেছেন—

ক) **কর্মযোগ** - মানুষকে তার কর্ম ও দায়িত্ব সম্পাদনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে যুক্ত হওয়া বা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা

খ) **ভক্তিযোগ** - ভক্তিরস সঞ্চারণের মাধ্যমে ও জীবপ্রেমের দ্বারা মানুষের মধ্যেই দেবতার উপলব্ধি

গ) **রাজযোগ** - মনঃসংযমের মাধ্যমে, ধ্যানের মাধ্যমে নিজের মধ্যে ঈশ্বরের/দেবত্বের উপলব্ধি

ঘ) **জ্ঞানযোগ** - জ্ঞান আহরণের দ্বারা জগৎ-সংসারের মধ্যে দেবত্বের বা ঈশ্বরের উপলব্ধি

তবে চারটি যোগের মধ্যে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিবেকানন্দ কর্মযোগের ওপরেই বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর উপদেশ ছিল—কর্মের দ্বারা মুক্তিলাভ করতে হলে নিজেকে সর্বদা কর্মে নিযুক্ত রাখতে হবে; কিন্তু সেই কর্ম থেকে নিজেকে তুষ্ট করার কোনও জাগতিক ফললাভের চেষ্টা করলে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।

আধুনিক ভারতের রূপকারদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ অন্যতম। তাঁর ধর্মাপোলব্ধির পিছনে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবদান অনস্বীকার্য। সত্য ও সরলতার মধ্যেই ধর্মের বিকাশ—এই মূলমন্ত্রে স্বামীজি জগতকে দীক্ষা দিয়েছিলেন এবং এই ধর্মচর্চার অনুশীলনের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতে তিনি 'বেলুড় মঠ' স্থাপন করেছিলেন।

ধর্মকে কোনও বাহ্যিক বিষয় হিসাবে না দেখে বা ধর্মীয় আড়ম্বরে মনোনিবেশ না করে বিবেকানন্দ প্রতিদিনের জীবনে ধর্মকে প্রয়োগ করে আত্মশুদ্ধি ও বলিষ্ঠ ভারত গঠনের ডাক দিয়েছিলেন; বলেছিলেন—''দরিদ্র, নিপীড়িত, আর্ত মানুষের সেবাই ঈশ্বর সাধনা।"

এছাড়াও স্বামীজির ধর্মপ্রচারে 'সর্বধর্ম সমন্বয়'-এর সুরও শোনা যায়। এক্ষেত্রে শুধু পরধর্ম সহিষ্ণুতা নয়; অন্যের ধর্মকে বুঝতে চাওয়া ও তাকেও সাদরে গ্রহণ করে বিশ্বমানবিকতার কথাও তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

অথবা,

ভারতে জাতিভেদ প্রথায় পরিবর্তনের কারণগুলি আলোচনা করো। ৪

উ: সনাতনী হিন্দু সমাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল—জাতব্যবস্থা। জন্মগতভাবে আরোপিত মর্যাদা হলেও এই জাতব্যবস্থা আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের সামাজিক স্তরায়নকে প্রকাশ করে। অনার্যদের ওপর আর্য জনজাতির দখলদারির ইতিহাস হল প্রকৃতপক্ষে জাতিভেদ প্রথার উৎস। পরবর্তীকালে জাতব্যবস্থার ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যাখ্যার (অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখ, হাত, ঊরু ও পদতল থেকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র জাতের উৎপত্তি) সাথে পেশাগত দিকটিও জড়িয়ে পরে এবং জাতব্যবস্থা একটি আপাত 'বন্ধ' সামাজিক বিভেদমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হয়।

কিন্তু প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা যেমন প্রায় নিশ্চল, অপরিবর্তনশীল এক বন্ধ ব্যবস্থা হিসাবে প্রচলিত ছিল পরবর্তীকালে, বিশেষতঃ ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের পর থেকে জাতিভেদ প্রথায় ক্রমে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তনের কারণগুলি হল ঃ-

১. **সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব–**

অধ্যাপক শ্রী এম. এন. শ্রীনিবাস আলোচনা করেছেন দক্ষিণ ভারতের নানা জনজাতির জীবনে জাতব্যবস্থায় যে ক্রমোচ্চ সামাজিক স্তরায়ন দেখা যেত সেখানে কীভাবে অপেক্ষাকৃত 'নীচু' জনগোষ্ঠী ওই অঞ্চলের 'প্রভুত্বকারি জাতি' (dominant caste)-এর জীবনযাপন, খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক ইত্যাদি অনুকরণের মাধ্যমে কয়েক প্রজন্মের চেষ্টায় সামাজিক স্তরায়নে উচ্চজাতির সমমর্যাদা লাভে সচেষ্ট হয়েছিল—এই প্রক্রিয়াকে তিনি 'সংস্কৃতায়ন' নামে অভিহিত করেছেন এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পরবর্তীকালে এইরকম সংস্কৃতায়ন পদ্ধতির অনুকরণে অপেক্ষাকৃত 'নীচু' জাতি সমাজে নিজেদের মর্যাদার উন্নয়নে সচেষ্ট হয়েছে।

২. **শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব–**

ব্রিটিশদের ভারতবর্ষে আগমনের সাথে সাথে ক্রমশ এদেশের শিল্পক্ষেত্রের বিস্তার হতে থাকে এবং তার সঙ্গেই নগরায়ণের সূচনা হয়। এই সময় থেকে দেখা যায় শিল্পের শ্রমিক হিসাবে কলকারখানায় যোগ দিতে বহু মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসেন। সেখানে কারখানা বা শিল্পাঞ্চলের কাছাকাছি একসাথে থাকতে বাধ্য হওয়া বা কলকারখানায় একসাথে কাজ করতে শুরু করায় ধীরে ধীরে জাতিভেদ প্রথার মধ্যে এক ধরনের শিথিলতা লক্ষ করা যেতে শুরু করে।

৩. **পশ্চিমীকরণের প্রভাব–**

ব্রিটিশদের এই দেশে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে তাদের জীবনযাপন, সংস্কৃতির প্রভাব এদেশের মানুষের ওপরেও পড়তে শুরু করে। ক্রমে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে জানা যায় ইউরোপীয় সভ্যতায় জাতিভেদের কোনও স্থান নেই। এদেশেও পশ্চিমের অনুকরণে নানা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় ধীরে ধীরে জাতিভেদ প্রথা হীনবল হতে শুরু করে।

৪. **আধুনিক শিক্ষার প্রসার–**

আধুনিক শিক্ষার মূল সুরটি হল—যুক্তিনির্ভরতা ও বিজ্ঞানমনস্কতা। এদেশে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যত গড়ে উঠতে শুরু করে ততই অন্ধবিশ্বাস ও ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রতি প্রশ্ন ওঠা শুরু হয়। এই আধুনিক শিক্ষাই জাতিভেদের মতো প্রাচীন, বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে পরিবর্তনের রসদ জোগায়।

৫. **সমাজসংস্কারকদের ভূমিকা–**

ভারতবর্ষের সনাতনী জাতিভেদ প্রথা যে অনেকটাই শক্তিক্ষয় করেছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হল এদেশের সমাজসংস্কারকদের ভূমিকা। এঁদের অনেকেই জাতিভেদ প্রথার বৈষম্যমূলক দিকটি নির্দেশ করেন এবং তাঁরা এই শোষণের ব্যবস্থাকে প্রশ্ন করে জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করার ডাক দিয়েছিলেন বা সেই উদ্দেশ্যে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে—বিবেকানন্দ, জ্যোতিবা ফুলে, সাবিত্রী ফুলে, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী এবং আম্বেদকরের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

৬. **অন্যান্য ধর্মের প্রভাব–**

সনাতনী হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতার প্রকাশ হল জাতিভেদ প্রথা। অন্যভাবে বলা যেতে পারে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্ম নিজের মহত্ব জাহির করার জন্য জাতব্যবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু সেই জাতিব্যবস্থায় তথাকথিত 'নীচু' জাত অর্থাৎ শুদ্র এবং অস্পৃশ্যরা (untouchable)—পরবর্তীকালে গান্ধী যাদের 'হরিজন' সম্বোধন করেন) অবর্ণনীয় শোষণের ও অত্যাচারের সম্মুখীন হতো। এমতবস্থায় জাতব্যবস্থার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিকল্প পথ হিসাবে অন্যান্য ধর্মমত নীচু তলার জনমানসে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তখন স্বেচ্ছায় বহু মানুষ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং পরিবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্ম এমনকি খ্রীষ্টধর্মে রূপান্তরিত হয়। এই ধর্মান্তরিতকরণ প্রক্রিয়া জাতব্যবস্থাকে একরকম শিথিল করে তোলে।

৭. **স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ–**

ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে স্বাধীনতা সংগ্রামে জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর জন্য অনেকাংশেই জাত ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট সামাজিক দূরত্ব দূরীভূত হয়েছিল।

৮. **বিভিন্ন আইনের প্রণয়ন–**

ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে বা তার প্রভাব কম করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আইনগুলির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়–

i) The Special Marriage Act, 1872

ii) The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989

iii) The Caste Disabilities Removal Act, 1850 ইত্যাদি।

উপরিউক্ত কারণগুলির জন্য ভারতে জাতিভেদ প্রথা থেকে একসময় যে সামাজিক অন্যায় ও অবিচার এবং বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার অনেকাংশে পরিবর্তন হয়। তবে আজও যে সম্পূর্ণরূপে জাতব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়েছে তা বলা যায় না।

2016

বিভাগ - খ

1. **বিকল্প উত্তরগুলির মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি লেখ ঃ-** **1×24**

(i) Prevention of Money Laundering Act হল ————এর জন্য

(a) দুর্নীতি প্রতিরোধ (b) সন্ত্রাসবাদ

(c) সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ (d) দারিদ্র দূরীকরণ

a

(ii) দুর্নীতির বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

(a) দুর্নীতি হল নিয়মবহির্ভূত

(b) দুর্নীতির সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কিত

(c) দুর্নীতির সঙ্গে টাকার কোনো সম্পর্ক নেই

(d) দুর্নীতির অঙ্গ হল ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা

c

(iii) উন্নয়নের 'চুঁইয়ে পড়া' প্রভাব ———— দূরীকরণের জন্য আলোচিত হয়।

(a) জনসংখ্যার সমস্যা (b) দারিদ্র

(c) নিরক্ষরতা (d) দুর্নীতি

b

(iv) বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়

(i) বৈশ্য (b) শুদ্র

(c) ক্ষত্রিয় (d) শ্রেণী

d

(v) আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ হল

(i) 1990 (b) 1991

(c) 1992 (d) 1993

b

(vi) 'ইকোলজি' শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন কে?

(a) আর্নেষ্ট হেকেল (b) হার্বার্ট স্পেনসার

(c) চার্লস ডিকেন্স (d) এইচ. কুলি

a

(vii) সাম্প্রদায়িকতার মুখ্য উপাদান

(a) ধর্ম (b) সম্প্রদায়

(c) জাতিভেদ (d) সমাজ

a

(viii) উল্লিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোন্‌টি ভারতে পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনের কারন সমূহের অন্তর্গত নয়?

(i) শিল্পায়ন (b) পশ্চাত্যায়ন

(c) নগরায়ন (d) স্বয়ং সম্পূর্ণতা

d

(ix) জনসংখ্যা বিষয়ক পঠন-পাঠনকে বলা হয়

(a) জনবিদ্যা (b) মনবিদ্যা

(c) সমাজবিদ্যা (d) নৃ-বিদ্যা

a

(x) কোনটি যৌথ পরিবারের সম্পর্ক নয়?

(a) দাম্পত্য সম্পর্ক

(b) বংশানুক্রমিতা

(c) ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকের সম্পর্ক

(d) মাতা-পিতা ও সন্তানের সম্পর্ক

c

(xi) 'আল-হিলাল' পত্রিকা কে প্রকাশ করেন?

(a) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

(b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(c) স্বামী বিবেকানন্দ

(d) এন. এ. টুথি

a

(xii) জাত ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নয় কোনটি?

(a) সহজাত (b) অর্জিত মর্যাদা

(c) সগোত্র বিবাহ (d) ক্রমোচ্চ বিন্যাস

b

(xiii) কোঠারি কমিশন গঠিত হয়েছিল ———————— দুরীকরণের জন্য।

(a) দারিদ্র্য (b) নিরক্ষরতা

(c) বেকারত্ব (d) দুর্নীতি

b

(xiv) 'নঈ তালিম' কার শিক্ষাচিন্তার ফলশ্রুতি?

(a) মৌলানা আজাদ

(b) মহাত্মা গান্ধী

(c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(d) স্বামী বিবেকানন্দ

b

(xv) ভারতবর্ষে বেকারত্ব, দারিদ্রের ———————— কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

(a) সামাজিক (b) ব্যক্তিগত

(c) অর্থনৈতিক (d) ভৌগলিক | c |

(xvi) 'Class, Caste and Occupation' শীর্ষক গ্রন্থটির লেখক কে?

(a) জি. এস. ঘুরে (b) এম. এন. শ্রীনিবাস

(c) জি. এইচ. হাটন (d) এস. সি. দুবে | a |

(xvii) লর্ড কর্নওয়ালিস কত সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করেন?

(a) 1793 (b) 1822

(c) 1905 (d) 1924 | a |

(xviii) F. D. I কার উপাদান?

(a) রাষ্ট্রীয়করণের

(b) বিশ্বায়নের

(c) অর্থনৈতিক উদারীকরণের

(d) ধর্ম নিরপেক্ষীকরণের | c |

(xix) কোনটি ভিন্ন চিহ্নিত কর ঃ

(a) Rural Sociology in India — এ. আর. দেশাই

(b) Social Change in Modern India - এম. এন. শ্রীনিবাস

(c) The Positive Background of Hindu Sociology - বিনয় সরকার

(d) An Essay of Hinduism - রাধারমন মুখার্জী | d |

(xx) ভারতে নবজাগরণের পথিকৃৎ হলেন

(a) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (b) অরবিন্দ ঘোষ

(c) রামচরণ মিত্র (d) রাজা রামমোহন রায় | d |

(xxi) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের পঠন-পাঠন শুরু হয়

(a) 1929/30 সালে (b) 1919/20 সালে

(c) 1975/76 সালে (d) 1968/69 সালে | c |

(xxii) 'Kinship Organization in India' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(a) হেনরি মেইন (b) ইরাবতী কার্ভে

(c) টি.এন.মদন (d) এস. সি. দুবে | b |

(xxiii) কত সালে কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়?

(a) 1748 (b) 1780

(c) 1784 (d) 1782 | c |

(xxiv) ভারতে 'দৃষ্টবাদ'র প্রবর্তন করেন কে?

(a) এস. সি. দুবে (b) স্যামুয়েল লব

(c) অমৃতলাল রায় (d) রামকৃষ্ণ মুখার্জী | b |

2. **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ** **1×16 = 16**

(বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়)

i) অ্যাসিড বৃষ্টি কী?

উ: বিভিন্ন কারণে বায়ুমণ্ডলে সালফার, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসগুলির অক্সাইড যুক্ত হয়। পরে এই পদার্থগুলি বৃষ্টি, তুষার, শিশির, জলকণা প্রভৃতি জলের বিভিন্ন রূপগুলির সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড প্রভৃতি রূপে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে। এই ঘটনাকে বলা হয় অ্যাসিড বৃষ্টি।

ii) বুনিয়াদী শিক্ষা কী?

উ: বুনিয়াদী শিক্ষা হল শিশু-কিশোরের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের সর্বাঙ্গীন বিকাশসাধন এবং জাতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করা। বুনিয়াদী শিক্ষা হল কাজের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন, স্বনির্ভর এবং ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের বুনিয়াদ।

অথবা

ভূমিসংস্কারের অর্থ কী?

উ: ভূমিসংস্কার কথাটির মূল অর্থ হল এক উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে আরেক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণের পথে পুরানো ভূমি মালিকানা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। এর সাথে যুক্ত হয়, জমির পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়াদির সংশোধন ও সংযোজন, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজকল্যাণের বার্তা।

iii) শূদ্রজাগরণের অর্থ কী?

উ: স্বামী বিবেকানন্দের মতে, ''এমন সময় আসবে যখন, শূদ্ররা তাদের শূদ্রসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো সঙ্গে নিয়ে প্রাধান্য লাভ করবে। প্রকৃতি ও আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ

অক্ষুন্ন রেখে সবদেশের শূদ্ররাই একাধিপত্য লাভ করবে, পৃথিবীর শূদ্রদের অভ্যুত্থান ঘটবে।" তিনি বুঝেছিলেন জগতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যুগের অবসান হয়েছে, আপাততঃ বৈশ্যযুগ এসেছে, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি শূদ্রযুগ আসবে। এটাই হল শূদ্রজাগরণ।

iv) 'নব্যমানবতাবাদ' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উ: 'নব্যমানবতাবাদ' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়।

অথবা

প্রথম কে বেথুন সোসাইটিতে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন?

উ: ১৮৬১ সালে লঙ্ সাহেব প্রথম বেথুন সোসাইটিতে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন।

v) 'নিম্নবর্গ' কথাটির তাৎপর্য কী?

উ: 'নিম্নবর্গ' বলতে সাধারণভাবে শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর সামাজিক অধীনতাকে বোঝানো হয়েছে। বৃহত্তর অর্থে এর দ্বারা সমাজের সেই সকল নীচুস্তরের মানুষদের বোঝানো হয় যারা শ্রেণী, জাতি, ভাষা ও লিঙ্গগত দিক থেকে অন্যান্যদের অধীন।

vi) পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত দুটি আন্দোলনের নাম উল্লেখ করো।

উ: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত দুটি আন্দোলনের নাম হল—চিপকো আন্দোলন ও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন।

অথবা

নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন কে, কেন শুরু করেছিলেন?

উ: নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন মেধা পাটেকর শুরু করেছিলেন। এইভাবে নর্মদা নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য গঠিত প্রকল্পের ফলে আশপাশের বহু এলাকা প্লাবিত হয়ে বহু মানুষের বাসস্থান ও জীবিকা হারানোর সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাই তিনি এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন।

vii) দুটি দুর্নীতি দমনমূলক সংগঠনের নাম লেখ।

উ: দুটি দুর্নীতি দমনমূলক সংগঠনের নাম হল—

1) প্রশাসনিক ভিজিল্যান্স ডিভিশন (Administrative Vigilance Division)

2) সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেসটিগেশন (Central Bureau of Investigation)

viii) I. M. F.-এর পূর্ণরূপ কী?

উ: International Monetary Fund.

অথবা

বিশ্বায়ন বলতে কী বোঝ?

উ: বিশ্বায়ন হল পারস্পরিক ক্রিয়া এবং আন্তঃসংযোগ সৃষ্টিকারী এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন দেশের সরকার, প্রতিষ্ঠান এবং জনগণের মধ্যে সমন্বয় ও মিথক্রিয়ার সূচনা করে। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সংস্থাগুলি বিশ্বজুড়ে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ix) যজমানি প্রথা ভেঙে পড়ার দুটি কারণ উল্লেখ কর।

উ: যজমানি প্রথা ভেঙে পড়ার দুটি কারণ হল–

1) বাজার অর্থনীতির উদ্ভব

2) শিক্ষা বিস্তার

x) সংস্কৃতায়ন বলতে কী বোঝ?

উ: যে উপায় বা পদ্ধতিতে একটি নিম্নস্তরের হিন্দু জাতি, উপজাতি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী, কয়েক প্রজন্মের প্রচেষ্টায় কোনো উচ্চজাতি বা দ্বিজ জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অনুসরণে নিজেকে রীতিনীতি, আদর্শ, প্রথা এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে, তাকেই সংস্কৃতায়ন বলে।

অথবা

ভারতের সমাজজীবনে প্রথম পর্যায়ে কাদের উপর পাশ্চাত্যায়নের প্রভাব পড়েছিল?

উ: যেহেতু পাশ্চাত্যায়নের প্রাথমিক প্রভাব লক্ষ করা যায় সমুদ্রোপকূলবর্তী বন্দর শহরগুলিতে কারণ পশ্চিমী দেশগুলি সমুদ্রপথেই ভারতে এসেছিল, তাই ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দুদের উপর পাশ্চাত্যয়নের প্রথম প্রভাব পড়েছিল।

xi) প্যাট্রিক গেডেস কে ছিলেন?

উ: প্যাট্রিক গেডেস ছিলেন একজন স্কটিশ জীববিজ্ঞানী, ভৌগোলিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং বিশেষত নগর পরিকল্পনাকারী। তিনি ছিলেন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক।

xii) সন্ত্রাসবাদ বলতে কী বোঝ?

উ: সন্ত্রাসবাদ হল একধরনের সহিংস আচরণ। এর লক্ষ্য হল বিশেষ রাজনীতিক উদ্দেশ্যে একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বা তার একটি বৃহত্তর অংশের মধ্যে ভয় সৃষ্টি ও সঞ্চারিত করা।

অথবা

সন্ত্রাসবাদের দুটি কারণ লেখো।

উ: সন্ত্রাসবাদের দুটি কারণ হল—

(1) যে কোনও ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী চিন্তা ও দর্শনের বিস্তার

(2) রাজনৈতিক ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থ চরিতার্থ করা এবং অধিকার কায়েম করার ষড়যন্ত্রমূলক অভিযান।

xiii) যৌথ পরিবার বলতে কী বোঝ?

উ: যৌথ পরিবার বলতে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের এমন এক গোষ্ঠীকে বোঝায় যারা একই ছাদের নীচে বসবাস করে, একই হাঁড়ির অন্ন খায়, যৌথভাবে পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক আত্মীয়তার সম্পর্ক বর্তমান।

xiv) জাতি-র সংজ্ঞা দাও।

উ: জাতি হল একটি বংশানুক্রমিক, অন্তর্বৈবাহিক, বন্ধ, সমসত্ত্ব গোষ্ঠী, যাদের সাধারণ একটি নাম আছে, সদস্যদের মেলামেশার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত থাকে এবং যাদের মধ্যে সামাজিক সচলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

অথবা

জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উ: (1) জাতি হল এক বন্ধ গোষ্ঠী কিন্তু শ্রেণী হলক মুক্ত গোষ্ঠী।

(2) জাতির ক্ষেত্রে মর্যাদা আরোপিত কিন্তু শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অর্জিত।

xv) ভারতে জনাধিক্য রোধে গৃহীত দুটি সুরাহা লেখ।

উ: (1) বিবাহের বয়স নিয়ন্ত্রন

(2) পরিবার পরিকল্পনা

xvi) ভারতে 'দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী' অনুশীলনের প্রবর্তক দু'জন সমাজতাত্ত্বিকের নাম লেখো।

উ: (1) গোপাল হালদার

(2) ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অথবা

ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর পথ প্রদর্শক দুজন সমাজতাত্ত্বিকের নাম লেখো।

উ: (1) বিনয় কুমার সরকার

(2) ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

SOCIOLOGY

2017

বিভাগ -ক

১. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ঃ- **(8×5)**

(a) ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের সূত্রপাত সম্পর্কে লেখো।

ভারতবর্ষে দৃষ্টবাদের প্রবর্তন সম্বন্ধে লেখো। **3+5**

উঃ বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্ব ভারতবর্ষে নতুন হলেও সমাজ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ভারতবর্ষে সেই সুদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে। নবজাগরণের সময় বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের চল না হলেও সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলি—রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির প্রাধান্য তুলনায় অনেক বেশি ছিল। ১৮৫১ সালে কলকাতায় **বেথুন সোসাইটি** প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে এই সালটিকেই সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ হিসাবে ধরা যায়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল একদিকে বাঙালিদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানানুশীলনের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে ইউরোপীয় ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে সদ্ভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে। **এফ. জে. মোয়াট, রেভারেন্ড জেমস্ লঙ, প্যারীচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র মিত্র, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার** প্রমুখ এই সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ সালে লঙ্ সাহেবই প্রথম বেথুন সোসাইটিতে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর ১৮৬৭ সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা' নামে একটি সংস্থা। এই সভায় সমাজতত্ত্ব ছাড়া অপরাপর সমাজবিজ্ঞান যেমন আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতো। শ্রীমতি মেরি কার্পেন্টার ব্রিটেনের **National Association for the Promotion of Social Science in great Britain-** এর সহযোগিতায় ভারতবর্ষে একটি সমাজবিজ্ঞান সংস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তথা অন্যান্য সাহিত্যিকগণ ইউরোপীয় জীবনচর্চা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে লেখালেখি শুরু করেন, যেগুলি সমাজচিন্তা সঞ্চারণে ভূমিকা পালন করে। ১৮৫৮ সালে প্রথম প্রকাশিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় একসময় ইংলন্ডের সামাজিক বিজ্ঞান সভার আদলে এদেশেও ওইরূপ একটি সংস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে।

- **ভারতবর্ষে দৃষ্টবাদের প্রবর্তন ঃ** ভারতবর্ষে যিনি প্রথম দৃষ্টবাদ প্রবর্তন করেন, তিনি হলেন হুগলি কলেজের অধ্যক্ষ **স্যামুয়েল লব**। এরপর যাঁরা দৃষ্টবাদ সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ বিশ্লেষণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হলেন-দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্ণনাথ মুখার্জী, রাধাকমল ভট্টাচার্য, অমৃতলাল রায়, রমেশচন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রমুখ। এঁরা সকলে সমকালীন কলকাতার 'পজিটিভিস্ট ক্লাব'-এর সক্রিয় সদস্য হিসাবে পরিচিত। এ ছাড়া এ প্রসঙ্গে আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁরা হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৮৫১ সালে কলকাতায় বেথুন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকে ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ হিসাবে অভিহিত করা যায়। **১৮৬১ সালে লঙ সাহেবই প্রথম বেথুন সোসাইটিতে সমাজতত্ত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।**

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (১৮৬৪-১৯৩৮)কে বলা হয় একজন মানবতাবাদী দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রধান চিন্তাবিদ। তিনি অগাস্ট কোঁতের দৃষ্টবাদের অন্যতম অনুসরণকারী। তাঁর মত ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বিশ্ব সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বিবেচনা করা মৌলিকভাবে ভুল। এই সময় পাশ্চাত্যের সমাজচিন্তা এবং ভারতীয় সমাজভাবনা-এ দুটির মধ্যে উভয়দেশের চিন্তাবিদদের তুলনামূলক আলোচনা চলতে থাকে। এছাড়াও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভায় একাধিক বিদগ্ধজন তাদের সমাজ সম্পর্কিত নিবন্ধ বিভিন্ন সময়ে পাঠ করেছিলেন। জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে সমাজতত্ত্বের আবির্ভাবের আগে থেকেই এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটেছে। বস্তুত সমাজজীবনের সমস্যাদি সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার সূত্রেই দর্শনশাস্ত্রের মত সমাজতত্ত্বের আলোচনায় মানুষের আগ্রহ। এইভাবেই সমাজতত্ত্বের এবং দৃষ্টবাদের সূত্রপাত ঘটে ভারতবর্ষে।

অথবা

কাঠামো ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তিগুলি লেখো। ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নে এম. এন. শ্রীনিবাস-এর ভূমিকা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করো। 3+5

উঃ কাঠামো ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের মৌলিক ভিত্তিগুলি হল ঃ-

১। সামাজিক কাঠামো বিমূর্ত প্রকৃতি সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ এটি সমাজের একটি ধারণাগত প্রকাশ যা সমাজের বাহ্যিক রূপ নির্দেশ করে।

২। সামাজিক কাঠামো প্রকৃত অর্থে কতকগুলি উপকাঠামো নিয়ে গঠিত হয়। (যেমন- কোনও একটি সমাজের অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি)

৩। সামাজিক কাঠামো তথা উপকাঠামোগুলিকে ক্রমবদ্ধরূপে পাওয়া যায়।

৪। সামাজিক কাঠামো একটি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ধারণা।

৫। সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন উপাদানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় এবং একটি উপাদানের ক্রিয়াশীলতা অন্য উপাদানের অবস্থান ও ক্রিয়ার নির্ভরশীল।

৬। প্রতিটি সমাজের কাঠামো বিশিষ্ট ও তার উপাদানগুলির ক্রিয়াশীলতা অনন্য প্রকৃতির হয়।

৭। সামাজিক প্রক্রিয়া সামাজিক কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

৮। সামাজিক কাঠামো যেকোনো সমাজের সংগঠন ও বিবর্তনের জন্য মূল ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

- **কাঠামো-ক্রিয়াবাদী প্রসঙ্গে এম. এন. শ্রীনিবাস-এর ভূমিকা ঃ**

ভারতের সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব, এই দুটি সামাজিক বিজ্ঞানের বিকাশে এবং জনজীবনের অর্থবহ পর্যালোচনায় শ্রীনিবাসের অবদান অবিস্মরণীয়। ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় জাতপাতের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রীনিবাস (M. N. Srinivas)-এর মতামত সুবিদিত। এই বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেকের অভিমত হল যে, ভারতীয় সমাজের সামাজিক স্তরবিন্যাসের স্থায়ী কাঠামোগত নীতিসমূহকে শ্রীনিবাসের বক্তব্য প্রত্যায়ন করে। কারণ শ্রীনিবাসের মতামতগত অবস্থান অনুযায়ী সামাজিক স্তরবিন্যাসের সংশ্লিষ্ট কাঠামোগত ভারতীয় নীতিসমূহ গণতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসাবে গতিশীল পরিবর্তন সমূহকে প্রতিপন্ন করে।

কল্পনাশ্রয়ী বা বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনা ব্যাপারে শ্রীনিবাসের কোনওরকম আগ্রহ বা ঝোঁক ছিল না। ন্যায়, সাম্য এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কিত তাঁর ধারণা তৃণমূলভিত্তিক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জাত প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ন (Sanskritization), প্রাধান্যকারী জাত (dominant caste), আন্তর্জাতমূলক বা উল্লম্বী (inter caste/ vertical) এবং আন্তর্জাতমূলক বা অনুভূমিক (inter-caste/horizontal) সংহতি প্রভৃতি পদগুলি প্রয়োগ করেছেন। এইভাবে তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতব্যবস্থার নমনীয় বা গতিশীল প্রকৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। পদ্ধতিগত অভ্যাসের ব্যাপারে শ্রীনিবাস ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর ভিত্তিশীল জাতিবিদ্যার গবেষণার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তবে ক্ষেত্র সমীক্ষার ব্যাপারে তাঁর ধারণা স্থানীয় এলাকার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। প্রাধান্যকারী জাত, 'যৌথ পরিবারের বিবাদ বিসংবাদ' প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের গ্রামীন জীবন সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত কিছু গবেষণাপত্র প্রণীত হয়েছিল অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক হিসাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ভিত্তিতে।

শ্রীনিবাসের গবেষণামূলক লেখাগুলির বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জাতীয় সংহতি, নতুন প্রযুক্তিবিদ্যা, লিঙ্গ বা স্ত্রী-পুরুষ সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট রচনা সমূহের বক্তব্য বিষয় আলোচিত গ্রাম ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু তিনি তাঁর রচনায় পদ্ধতিগত নিহিতার্থের তাত্ত্বিকীকরণ করেন নি। শ্রীনিবাসের ''Religion and Society among the Coorgs of South India'' শীর্ষক ক্ষেত্র সমীক্ষামূলক বিখ্যাত রচনাটি অভিন্ন প্রকৃতির তাত্ত্বিক কাঠামোর উপর ভিত্তিশীল। আচারনুষ্ঠান এবং সামাজিক সংহতির মধ্যে পারস্পরিক জটিল সম্পর্ক উল্লিখিত গ্রন্থটিতে সহজ সরলভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

শ্রীনিবাসের ''Religion and Society among the Coorgs of South India'' শীর্ষক রচনাটি হল আসলে স্থানীয় একটি জনসম্প্রদায়কে নিয়ে একটি কাঠামোগত সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনাটির দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক বিষয়গুলি হল ঃ-

(১) ভারতীয় সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তীমূলক ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীনিবাস জনসম্প্রদায়কে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত সভা বা একক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্রিয়াবাদী অভ্যাস থেকে সরে আসেন। তিনি সভ্যতামূলক মানদণ্ডে কুর্গ জনসম্প্রদায়ের অবস্থান নির্ধারণে আত্মনিয়োগ করেছেন। এক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের স্বার্থে তিনি স্থানীয়, আঞ্চলিক, সর্বভারতীয় পর্যায়ে আলোচনাকে উন্নীত করেছেন।

(২) দ্বন্দ্বমূলক প্রক্রিয়াকে উদাহরণ সংযোগে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীনিবাস দেখিয়েছেন যে কুর্গ জনসম্প্রদায়ের কিছু বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী চারপাশের জাতভিত্তিক হিন্দুসমাজের সঙ্গে টিকে থাকার মত একটা সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিল।

অন্তর্ভুক্তিকরণ / বহিষ্কারকরণের প্রক্রিয়াকে শ্রীনিবাস Sanskritization অভিধায় অভিহিত করেছেন। এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়াটি হল একটি তাত্ত্বিক কাঠামো। শ্রীনিবাস সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির একটি সমান্তরাল প্রক্রিয়ার কথাও বলেছেন। সেটি হল 'Westernization'।

(b) সংস্কৃতায়ন বলতে কী বোঝ? ধর্মনিরপেক্ষীকরণের বৈশিষ্ট্য ও ভারতে এর সমস্যা সম্পর্কে লেখো। 3+5

উঃ সংস্কৃতায়ন শব্দটি প্রখ্যাত ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী শ্রীনিবাসের সৃষ্টি। তিনি তাঁর ''Religion and Society among the Coorgs of Southern India" গ্রন্থে ১৯৫২ সালে সর্বপ্রথম সংস্কৃতায়ন শব্দটি ব্যবহার করেন। সামাজিক স্তরবিন্যাসে একটি নীচুজাতের অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অধ্যাপক শ্রীনিবাস ''সংস্কৃতায়ন'' নামে আখ্যায়িত করেছেন। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে 'সংস্কৃতায়ন' হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীচুজাতের হিন্দু বা আদিবাসী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিজেদের বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, আদর্শবোধ ও জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তন করে এবং উঁচুজাতের সমান হওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হয়। সংস্কৃতায়ন হল একটি অনুকরণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় নীচুজাতের মানুষজন উঁচুজাতের বা ব্রাহ্মণদের ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, মূলবোধ, রীতিনীতি, জীবনধারা, আচারানুষ্ঠান প্রভৃতি অন্ধভাবে অনুসরণ-অনুকরণ করে। শ্রীনিবাসের অভিমত অনুসারে উচ্চবর্ণের জাতের জীবনমাত্রার প্রণালী অনুকরণ করার ব্যাপারে নিম্নবর্গের জাতের মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষীকরণের বৈশিষ্ট্য ঃ- ইয়ান রবার্টসন তাঁর Sociology গ্রন্থে বলেছেন— ধর্মনিরপেক্ষীকরণ হল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে সনাতন ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজের ওপর তার প্রভাব হারায়।

বৈশিষ্ট্য ঃ-

(ক) বিশেষ কোনো ধর্মের প্রাধান্যহীনতা ঃ- ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহে কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হয় না বা প্রাধান্য দেওয়া হয় না।

(খ) পৃথকীকরণ ঃ- আধুনিক সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, নৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে পৃথকীকরণ সৃষ্টি করে। এগুলির উপর ধর্মের কোনো প্রভাব থাকে না। ধর্ম একটি আলাদা সামাজিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

(গ) যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ঃ- যৌক্তিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রকাশ করে থাকে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও আবেগ তাদেরকে চালিত করে না। বহু সামাজিক প্রথা ও নিয়মকানুন এখনও টিকে আছে শুধু মাত্র তাদের যৌক্তিকতার কারণে। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার ব্যক্তিবর্গের বিজ্ঞানমনস্কতার জন্ম দেয়, এই মনোভাব থেকে ব্যক্তি কোনো সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেয়।

সমস্যা ঃ- পাশ্চাত্য দেশের থেকে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষীকরণের ধারণা অনেকটাই আলাদা। ভারতবর্ষে ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্ম ও রাষ্ট্রকে আলাদা করে না। ভারতীয় সংবিধান ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অনুমোদন করে। আইনগতভাবে অনেক অসামাঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন— বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় মুসলিমদের 'শারিয়া' মতানুসারে কিছু নিজস্ব আইন ধার্য করা আছে, অন্যদিকে হিন্দু, শিখ ও খ্রিস্টানরা কমন আইন মান্য করে। আবার সংবিধান কিছু আর্থিক অনুমোদন প্রদান করে ধর্মীয় বিদ্যালয়গুলিকে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে (মন্দির, মসজিদ প্রতিষ্ঠা)। Islamic Central Wakf Council এবং কিছু সমস্যা তৈরি করেছেন। যেমন—বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, অসামঞ্জস্য উত্তরাধিকার, আইন বহির্ভূত বিবাহ বিচ্ছেদ, কিছু ধর্মীয় আইন মান্যতার খাতিরে। ভারতীয় নিরিখে ধর্মনিরপেক্ষীকরণ নিছক-ই সংবিধানে লিখিত, আসলে তা ''**pseudo-secularism**''। এর থেকে জন্ম নিচ্ছে ''Minority'' বা ''Pluralism''-এর মত কিছু মতামত যা ভারতীয়দের মধ্যে বিবেধ সৃষ্টি করছে। ভারতীয় সংবিধানের ''শারিয়া''-কে মান্যতা দেওয়া ''Equality before the Law'' নীতি বিরুদ্ধ। ফলে ভারতীয়দের মধ্যে মানসিকতা, অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা হ্রাস পাচ্ছে।

(c) পরিবার ব্যবস্থার সাম্প্রতিক যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে সে সম্পর্কে তোমার ধারণা লেখো। **8**

উঃ পরিবারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল ''family''। ''Family'' শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ''famulus'' থেকে। পরিবার হল ব্যক্তিবর্গের একটি গোষ্ঠী যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে

নারী পুরুষের স্থায়ী যৌন সম্পর্ক বর্তমান থাকে। পৃথক একটি নামে পরিচিত থাকে, যার মধ্যে সদস্যদের ভিতরে রক্তের সম্পর্কে থাকে, যারা অভিন্ন বাসস্থানে বসবাস করে এবং যার মধ্যে সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক বন্দোবস্তের ব্যবস্থা থাকে।

পরিবার ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাম্প্রতিক প্রবণতা ঃ- মানবসমাজের একটি স্বাভাবিক সংগঠন হিসাবে পরিবারের বিশ্বজনীনতা সকল বিরোধ বিতর্কের ঊর্দ্ধে। বর্তমানের পরিবারগুলোর অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে পরিবার ব্যবস্থা যে সকল অভিমুখে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, সেগুলি হল ঃ-

(ক) পারিবারিক অর্থনীতির অবসান ঃ- বর্তমান যুগ বৃহদায়তন শিল্প বিশিষ্ট অর্থনীতি নির্ভর। এর সাথে অসম প্রতিযোগিতার স্বাভাবিক ফল হিসাবে পারিবারিক কুটির শিল্পগুলোর সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেছে।

(খ) পরিবারের অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য বা "স্বয়ম্ভরা" বিষয়টির অবসান ঃ- একটা সময় ছিল, পরিবার ছিল একটি স্বয়ম্ভর আর্থিক সংগঠন, উৎপাদন, ভোগ, বন্টন - এই মুখ্য তিনটি অর্থনৈতিক উপাদান কর্মকাণ্ড পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আধুনিক শিল্পসভ্যতার যুগে পুরুষ-নারী উভয়েই শিল্প কলকারখানা কিংবা চাকরিক্ষেত্রে নিয়োজিত। পারিবারিক শ্রমবিভাজনের জায়গায় স্থান নিয়েছে শিল্পভিত্তিক শ্রমবিভাজন।

(গ) পারিবারিক সংগঠনে বিশৃঙ্খলা ঃ- পরিবার হল উদ্দেশ্যগত অভিন্নতা, পারস্পরিক দায়দায়িত্ব ও সংহতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক সংগঠন। পরিবারের চিরাচরিত বিন্যাস নষ্ট হয়েছে। তার ফলে পরিবার ব্যবস্থা ব্যাপক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

(ঘ) গৌণ গোষ্ঠী / সংস্থা সমূহের উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ- আগে পরিবার যে সকল কাজ তার সদস্যদের মাধ্যমেই সমাপন করত, ক্রমে এখন তা বর্তেছে বিভিন্ন গৌণ গোষ্ঠীর উপর। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, সন্তান প্রতিপালনের মতো একান্ত একটি পারিবারিক কর্তব্যের দায় এখন ক্রেশ, বেবী সিটার, কিন্ডার গার্টেন-এর মতো সংস্থার উপর।

(ঙ) পারিবারিক সম্পর্কের দৃঢ়তা হ্রাস, নিঃসঙ্গতা, বিষাদ, বিবাহবিচ্ছেদ ঃ- আজকের দিনে ভেঙে পড়া সাবেকি যৌথ পরিবারগুলির স্থানে গড়ে উঠেছে দম্পতিকেন্দ্রিক একক পরিবার। কিন্তু সেই সংগঠনেও সম্পর্কের পরিধির সীমানা সংকুচিত হয়ে আসছে। নিজের মতো করে বাঁচার প্রবণতা শিথিল করেছে পারিবারিক পারস্পরিক বন্ধনের টানকে। বিভিন্ন কারণবশত বিবাহবিচ্ছেদ এবং তার ফলস্বরূপ স্বামী স্ত্রীর পৃথক বসবাস অবসাদ বা নিঃসঙ্গতা আনতে পারে। অপরদিকে এই ধরনের পরিবারের সন্তানদের উপর মানসিক চাপ আসতে পারে, যা পরবর্তীতে বিষাদে পরিণত হতে পারে।

(চ) কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধি ঃ- আধুনিক পরিবারসমূহের অসংগঠন ও বিশৃঙ্খল পরিবেশই কিশোর অপরাধীর সংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক বলে মনে করা হয়। অবশ্য এর সাথে রয়েছে আধুনিক বাজার অর্থনীতির উপাদানসমূহ, যেমন-বিলাসদ্রব্য, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন, চাকচিক্য, উত্তর আধুনিকতার স্পর্শ।

(ছ) দুই পুরুষের বিরোধ 3rd generation- এর কর্তৃত্ব ঃ আধুনিক পরিবারগুলিতে দুই পুরুষের সম্পর্কের প্রকৃতি ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। পুত্র বা কন্যার উপর বাবা-মার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং পরিবর্তে ''বাবা-মা''-র প্রতি সন্তানের আনুগত্য আজ একটা চোখে পড়ে না। এই দুই পুরুষের মানসিক ব্যবধান বাড়তেই থাকছে। কোনো সংস্কার বা সিদ্ধান্ত ঘিরে এই ব্যবধান প্রকট হয়ে ওঠে, যা তথাকথিত generation gap হিসাবে চিহ্নিত। পুত্র কন্যারা গৌণ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের যেমন-ক্লাব, সংগঠন, রাজনৈতিক দল, কর্মক্ষেত্র, বিনোদন কেন্দ্র প্রভৃতির প্রতি আকর্ষিত হয়ে পড়ার ফলে পিতা-মাতা বা বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্তৃতের এবং প্রভাবের চেয়ে তৃতীয় প্রজন্মের প্রভাব বেশি করে কায়েম হয়।

(জ) পরিবারের বিলুপ্তির আশঙ্কা ঃ- বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে আজ পর্যন্ত পরিবার প্রথার ব্যাপক পরিবর্তন পরিবারের শুধু যে মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করেছে তা নয়, পরিবারের বিলুপ্তির আশঙ্কাকেও প্রকট করে তুলছে। সমাজতত্ত্ববিদগণের অনেকেই মনে করেন ভবিষ্যতে সন্তান প্রজনন ও লালন পালনের জন্য দু-এক বছর পরিবারের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে।

অন্যদিকে আশাবাদীগণেরা মনে করেন নামে পরিবার প্রথা ব্যাপক পরিবর্তন ও অবক্ষয়ের আবর্তে পড়েছে বরং তারা মনে করেন যে পরিবার ব্যবস্থা কিছু প্রতিকূল শক্তির সম্মুখীন হয়েছে। তাঁরা বিশ্বাস করেন আজও মানবসমাজ পরিবার হল সন্তান প্রজনন ও বংশগতি বজায় রাখার একমাত্র উপায়।

উপসংহার ঃ- কাঠামো ও কার্যগত বিচারে আধুনিক পরিবারের পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও পরিবারের ভূমিকার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। সামাজিক সংহতি ও সমগ্র সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবারের ভূমিকা অনন্য সাধারণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি হল পরিবার।

অথবা

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ভারতে ভূমি সংস্কারের পরিকল্পনাগুলি আলোচনা করো। 8

উঃ স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরে পরেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমলে দেশের ও দেশবাসীর জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার ভাবনায় ভূমিসংস্কার এবং শিল্পায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

ভূমিসংস্কারের লক্ষ্য ঃ-

(ক) 'লাঙল যার জমি তার'-এই নীতির বাস্তবায়ন।

(খ) সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জমির পুনর্গঠন।

(গ) প্রজাস্বত্ব সংস্কার।

(ঘ) জমির ঊর্ধ্বসীমা স্থির করা এবং অতিরিক্ত জমি চিহ্নিত ও অধিগ্রহণ করে প্রান্তিক ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা।

(ঙ) প্রকৃত প্রজার নাম নথিভুক্তকরণ, তার যথাযথ নথি রক্ষণাবেক্ষণ।

(চ) জমির উর্ধ্বসীমা ও প্রজাস্বত্বের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা।

(ছ) নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রজাস্বত্ব বৈধকরণ।

(জ) সমবায়িক ধাঁচে কৃষিব্যবস্থার উন্নতিসাধন।

পরিকল্পনা ঃ- উপরিউক্ত লক্ষ্য অনুযায়ী, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময় ১৯৫৪ সালে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রায় সমস্ত রাজ্যেই এ সম্পর্কে আইন পাশ হয়। এই আইনের সাথে সাথে জমির ঊর্ধ্বসীমা নিয়ন্ত্রণ আইনও পাশ হয়। এছাড়াও প্রজাস্বত্ব সংস্কারের দিকটি দেখার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলিও ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত নানা ধরনের আইন প্রচলন করে।

- প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে, আমূল ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের হাতে কৃষি জমি অর্পণের প্রয়াস।
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে নতুন কৃষি কৌশল গ্রহণ ও সবুজ বিপ্লব।
- কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, হিমঘর স্থাপন, কেন্দ্রীয় গুণগত নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার, নিয়ন্ত্রিত বাজার, গণমাধ্যম দ্বারা কৃষিপণ্যের দাম প্রচার, **১৯৫২ সালে কৃষি বাজার কমিশন গঠন, কৃষি পণ্যের ব্যয় ও জাতীয় সমবায়** উন্নয়ন পর্ষদ গঠন, কৃষিপণ্য বিক্রয়করণ ও পরিদর্শন সংখ্যা স্থাপন।
- কৃষিক্ষেত্রে অর্থের জোগান সুনিশ্চিতকরণ-সমবায় ঋণদান সমিতি গঠন, ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন। ১৯৫৫ সালে ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপন ১৯৯২ সালে জাতীয় কৃষি ও গ্রামীন উন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন (NABARD)। ১৯৬৮ সালে কৃষি অর্থ জোগান করপোরেশন (Agricultural Finance Corporation) স্থাপন, তাকাভি ঋণ প্রদান প্রভৃতি।
- ১৯৭৫ সালের বিশ দফা কর্মসূচি (20 Point Programme)

- বিভিন্ন কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি—IRDP-1976, NREP-1976, RWP-1971, RLEGP, TRY-1989, PMRY-1993, SGSY-1999, SGRY-2001, DWCRA-1982, অন্তোদ্যয় (2000), অন্নপূর্ণ যোজনা (2000), আশ্রয় বিমা যোজনা (2001), ইন্দিরা আবাস যোজনা (1999), কিষাণ ক্রেডিট কার্ড, বন্দে-মাতরম যোজনা, কাজের বদলে খাদ্য যোজনা (FWM - 1977) MGNREGS বা ১০০ দিনের কাজ প্রভৃতি।
- ১৯৫৯ সালে বলবন্ত রাই মেহতার সুপারিশক্রমে পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা।
- ১৯৯১ সালে উদার অর্থনৈতিক সংস্কার শিল্প ও বাণিজ্যনীতি ঘোষণা।
- ১৯৯৭ সাল থেকে FDI-র পথ উন্মোচন, পাইকারি বাজারের ক্ষেত্রে ১০০% বিদেশি বিনিয়োগ অনুমোদন।

প্রথম ১৯৫০ সালে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইন প্রণীত হয়। ১৯৭১ সালের কেন্দ্রীয় ভূমিসংস্কার কমিশন (Central Land Reforms Commission)-এর সুপারিশ ক্রমে ১৯৭২ সালে সকল রাজ্য সরকার জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ আইনের পরিমার্জন করে। বিভিন্ন রাজ্যে সর্বোচ্চ সীমা বিভিন্ন রকম। যাই হোক সাধারণভাবে জাতীয় নীতিনির্দেশ মান্য করে বিভিন্ন রাজ্যে জোতের সর্বোচ্চ সীমা পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কিত নতুন আইন প্রণীত হয়।

(d) ধর্ম বলতে কী বোঝো? সমাজে ধর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করো। 3+5

উঃ ধর্ম, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা মানুষের মনোজগতের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী এক বিশেষ শক্তি। **'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি ধৃ-ধাতু থেকে**-যার অর্থ যা মানুষকে ধারণ করে তাই হল ধর্ম। কিন্তু ব্যাপক অর্থে মানুষের জীবনধারাকে ধারন করে আছে বহু ও বিভিন্ন সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি ও আচার-অনুষ্ঠান। ধর্ম হল অলৌকিক, অপার্থিব, অতিপ্রাকৃত, অতিমানবিক, উচ্চতর, সর্বশক্তিমান এক অদৃশ্য সত্তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস। ধর্মের দুটি দিক বর্তমান-অন্তরঙ্গ দিক ও বহিরঙ্গ দিক। অন্তরঙ্গ দিক হল উক্ত সত্তার প্রতি প্রেম, ভয়, ভক্তি, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানসিক আবেগ অনুভূতিগুলি এবং বহিরঙ্গ দিক হল পূজার্চনা, অনুষ্ঠান, যজ্ঞ, হোম, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ। ধর্ম পার্থিব বা অপার্থিব কিছু পাওয়ার আশায় পালন করা হয়। ধর্মের মাধ্যমে মানুষের সাথে ঈশ্বরের সংযোগ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। ধর্মের সাথে পবিত্রতা, শুচিতা, পুণ্য, পাপ প্রভৃতি ধারণা যুক্ত থাকে।

- **ধর্মের গুরুত্বঃ**- ধর্মের সামাজিক ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক প্রকৃতির। ধর্ম মানুষের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ফলে ধর্ম সমাজকেও প্রভাবিত করে। টয়েনবী, ডসন প্রমুখ বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানীদের মতানুসারে মানবসভ্যতার মর্মস্থলে ধর্মের অস্তিত্ব বর্তমান। ব্যক্তিজীবনে এবং সমাজজীবনে ধর্মের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ভূমিকা বর্তমান।

ইতিবাচক ভূমিকা ঃ-

১। **নিয়ন্ত্রণমূলক ভূমিকা ঃ-** ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ এবং সমাজ জীবনের ধারা ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

২। **নিরাপত্তাবোধ ও সান্ত্বনার সঞ্চার ঃ-** জীবনদর্শন বা জীবনের অর্থ অনেকাংশে ধর্ম বিশ্বাসের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। নিরাপত্তাবোধের অভাব মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। অতীন্দ্রিয় দৈবশক্তির আশ্রয় ও অনুকম্পা লাভ করে মানুষ হতাশা মুক্তি হয়।

৩। **নীতি ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঃ-** সুস্থ সমাজজীবনের স্বার্থে নীতি ও আদর্শকে যথাযথ মূল্য ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং তার সংরক্ষণ ও বিস্তারের ব্যবস্থা করা দরকার।

৪। **ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত করে ঃ-** সমাজবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি ও বস্তুজগতকে ধর্ম বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। মানুষের ধর্মবোধ ও শিক্ষার সঙ্গে তার ব্যবহারিক জীবনের সংযোগ সম্পর্ক গভীর।

৫। **সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি ঃ-** মানুষের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সৌভ্রাতৃত্বকে সঞ্চারিত করে।

৬। **ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণ ঃ-** যথার্থ ধর্মবোধ সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সম্পাদন ও সংরক্ষণের কাজকে সহজতর করে।

৭। **জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে ঃ-** সম্যক ধর্মবোধ ব্যক্তিমানুষকে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করে।

৮। **ললিতকলার সমৃদ্ধি সাধন ঃ-** ধর্মবোধের অণুপ্রেরণার সুবাদে মানুষ অনেক সময়েই সাড়া জাগানো সংগীত, সাহিত্য, চিত্রকলা সৃষ্টি করেছে।

নেতিবাচক ভূমিকা ঃ

১। **মানুষকে অদৃষ্টবাদী ক্লীব করে ঃ-** ধর্মীয় প্রভাবে মানুষের মনে অন্ধ বিশ্বাসের সৃষ্টি করে।

২। **আফিঙের নেশা এবং শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার ঃ-** মার্কসীয় বক্তব্য অনুযায়ী ধর্মকে হাতিয়ার দিয়ে আফিঙের নেশার মত মানুষকে বিভোর করে রাখা হয় এবং এইভাবে সমাজের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী শোষণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

৩। **বিজ্ঞান বিরোধী ঃ-** ধর্মবিরোধী মতানুসারে ধর্ম হল বিচার বিযুক্ত এবং আবেগ মুক্ত চিন্তাধারার সমষ্টি। ধর্ম সমাজজীবনে বহু কুসংস্কারের সৃষ্টি করে। ধর্ম বিজ্ঞানবিরোধী।

৪। **রক্ষণশীল ও প্রগতি বিরোধী ঃ-** ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাস হল শাশ্বত, চিরন্তন ও সময়কালের নিরপেক্ষ।

৫। **ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা** ঃ- মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশের পথে ধর্ম প্রতিবন্ধক হিসাবে প্রতিপক্ষ হয়।

৬। **সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে** ঃ- অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করে।

ধর্মের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে বর্তমানে ধর্মের কর্মক্ষেত্র ও কার্যক্রমের পরিবর্তন ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

(e) শিক্ষা বলতে তুমি কী বোঝো? শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর্যবেক্ষণ লেখো। 3+5

উঃ শিক্ষার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'education' এই ইংরেজি শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে একটি ল্যাটিন শব্দ থেকে। এই ল্যাটিন শব্দটি হল ''educare'' যার অর্থ হল **বড় করা বা পালন করা** (bring up) মানবসমাজে শিক্ষা হল ব্যক্তিবর্গের একটি বুনিয়াদি ব্যবস্থা বা কার্য। মানবসমাজের অব্যাহত অস্তিত্বের জন্য নতুন প্রজন্মের মধ্যে জীবনধারা বা সংস্কৃতিকে সঞ্চারিত বা প্রবাহিত করে। 'শিক্ষা' হল একধরনের বিশেষ সংস্কার সাধন। সঠিক অর্থে শিক্ষা শুধুমাত্র একটি পদ্ধতি নয়। সর্বাত্মক শিক্ষা হল এক ধরনের স্বয়ং শিক্ষা। আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষক ছাড়াও 'শিক্ষণ' বা 'শিক্ষা' সম্ভব। ব্যাপক ও সংকীর্ণ উভয় অর্থেই 'শিক্ষা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বিদ্যায়তনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝায় না। ব্যাপক অর্থে শিক্ষা সমাজের জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের সুপ্ত মানসিক শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন। শিক্ষার্থীকে সঠিক তত্ত্ব ও তথ্য সরবরাহ করা এবং মানসিকতার ত্রুটিসমূহ সংশোধন করা। স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরণের সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে ওঠে। সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তিবর্গকে বাছাই করার ব্যাপারে শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা সামাজিক দুষ্ক্রিয়তা রোধ করে, সামাজিক ঐক্য ও সংহতি সংরক্ষণ করে। শিক্ষা সামাজিকীকরণকে সার্থক করে।

- **শিক্ষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ- শিক্ষাবিদ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে এক বিশেষ শিক্ষাধারার প্রবর্তনের প্রয়াসী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে সমর্থন করেছেন, তিনি শিশুর সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের উপর জোর দিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি সামাজিক আবেগ অনুভূতি এবং মানসিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি শান্তিনিকেতনে এক আদর্শ পরীক্ষামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ-

(ক) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল বিদ্যার্থীর ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন ও জীবনের আদর্শ অনুশীলনে সাহায্য করা।

(খ) রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুযায়ী শিক্ষা প্রাত্যহিক জীবনধারার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে এবং একতারে চলতে থাকবে।

(গ) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় **জনশিক্ষার** উপরও জোর দেওয়া।

(ঘ) রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(ঙ) পাঠকক্ষের চারদেওয়ালের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থাকে তিনি ''খোপওয়ালা একটি বড় বাক্স'' হিসাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি বিদ্যার্থীদের মধ্যে **বিশ্বনাগরিকতা** বোধের বিকাশ দেখতে চেয়েছিলেন।

(চ) রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার কথা বলেছেন।

(ছ) তিনি জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ তৈরির ক্ষেত্রে **প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার** সমন্বয়ের ভাবনা ভেবেছেন।

(জ) তাঁর মতানুসারে দৈহিক শিক্ষার সঙ্গে মানসিক শিক্ষার সংযোগ স্থাপন করা উচিত।

(ঝ) বিশ্বভারতীতে সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী হিসাবে খেলাধুলা, গান-বাজনা, নাটক, নৃত্য, শিল্পকলা, বাগান পরিচর্যা প্রভৃতি কার্যক্রম গৃহীত হয়।

(ঞ) শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি খেলার উপযোগিতার কথা বলেছেন।

(ট) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

(ঠ) কেতাবী পাঠ্যক্রমের পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন।

(ড) তাঁর শিক্ষানীতিতে জাতীয় সংহতি ও বিশ্বশান্তির আদর্শকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(ঢ) রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রামোন্নয়নের আদর্শকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অথবা

গণমাধ্যম-এর সংজ্ঞা দাও। গণমাধ্যম-এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলি লেখো। 3+5

উঃ আধুনিককালে ব্যক্তিগত ও সমষ্ঠিগত জীবনের অন্যতম অপরিহার্য অংশ হল গণমাধ্যম। ''গণ-মাধ্যম'' বলার অর্থ এ মাধ্যম ব্যাপক সংখ্যক দর্শক শ্রোতাসাধারণের কাছে পৌঁছে যায়। গণমাধ্যমকে অনেকসময় গণ-যোগাযোগ (Mass communication)-ও বলা হয়। কারণ গণ-মাধ্যমসমূহের মাধ্যমে গণ-যোগাযোগ সম্পাদিত হয়। অত্যাধুনিক জীবনধারায়

কোনো না-কোনোরকমের গণ মাধ্যম বা গণ-যোগাযোগ ব্যতিরেকে সভ্যতার কথা ভাবা যায় না। সাম্প্রতিককালে গণ মাধ্যম প্রাত্যহিক জীবনের অন্যতম অঙ্গে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে আজকাল প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো ধরনের গণ মাধ্যমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

গণমাধ্যম বিভিন্ন ধরন বা প্রকারের হয়। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখযোগ্য হল বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপন, মোবাইল, ভিডিও গেম, ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েবসাইট প্রভৃতি। বিশ্বের মধ্যে সংবাদপত্রের বৃহত্তম বাজার হল ভারত। এদেশে দৈনিক একশ মিলিয়ন সংবাদপত্র বিক্রি হয়। সাম্প্রতিককালে সকল রকমের গণ-যোগাযোগ মাধ্যমের অভাবনীয় বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। বর্তমানে শহরাঞ্চলে তো বটেই এমনকী শহরতলি অঞ্চলেও সমাজের সকল শ্রেণির মানুষজনের হাতে মোবাইল দেখা যায়। প্রবাসী ভারতীয়রা টেলিফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতির মাধ্যমে দেশের পরিবার পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে।

- **গণমাধ্যমের ইতিবাচক ভূমিকা ঃ-**

(১) **গণতন্ত্রের সংরক্ষণ ও বিকাশ ঃ-** বর্তমান সমাজে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম আমাদের জীবনে দুটি অতি প্রয়োজনীয় দিক। তার গণমাধ্যম তা নিশ্চিত করে যোগাযোগ আর স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে। গণমাধ্যম সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন পরিকল্পনা কর্মসূচির বিষয়ে জনগণকে সচেতন রাখে।

(২) **সামাজিকীকরণ ভূমিকা ঃ-** শিক্ষিত সমাজে সামাজিকীকরণের অন্যতম মাধ্যম হল গণমাধ্যম। সংবাদপত্র বা টিভি, রেডিওতে প্রকাশিত কোনো খবর বা অনুষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তাচেতনাকে প্রভাবিত করে ও তাকে সুগঠিত করে।

(৩) **সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা ঃ-** গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন অসামাজিক ঘটনার শাস্তির দিক, নতুন নতুন আইন সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশাবলি প্রভৃতি জানতে পেরে আমরা আমাদের ইতিকর্তব্য স্থির করি।

(৪) **শিক্ষামূলক ভূমিকা ঃ-** গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে বাস্তবসম্মত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়গুলি উপস্থাপিত হয়। এতে শিক্ষার্থীর শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। গণমাধ্যমের হাত ধরেই জনশিক্ষার বিস্তার, ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি এবং অবসর যাপনের শিক্ষণ বিষয়টি পরিপূর্ণতা পায়।

(৫) **আধুনিকীকরণ ঃ-** আধুনিকীকরণের বিভিন্ন উপাদানগুলি গণমাধ্যমের দ্বারাই অতি সহজে মানুষের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। নিত্যনতুন ভোগ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপন, সেগুলির চিত্তাকর্ষক উপস্থাপন, আমাদের মস্তিষ্ককে নাড়া দেয় এবং আমরা সেগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কুসংস্কার-কুপমণ্ডুকতাকে দূর করতে সাহায্য করে।

(৬) এছাড়াও গণমাধ্যম আমাদের বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধি করে, নান্দনিকতার বিকাশ ঘটায়, পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সংযোগ গড়ে দেয় জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটায়, আমাদের পরিতৃপ্তি প্রদান করে।

- **নেতিবাচক ভূমিকা** ঃ- গণমাধ্যমের সাফল্য নির্ভর করে গণমাধ্যম পরিচালক ও সংবাদ কর্মীদের উপর। এর থেকে কোনোরূপ বিচ্যুতি গণমাধ্যমের নেতিবাচক দিকগুলিকে প্রকট করে।

(১) গণমাধ্যমগুলির নিরপেক্ষতা এখন প্রশ্নচিহ্নের সামনে। বর্তমানে বিভিন্ন নিউজ চ্যানেল একই সংবাদ বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করে। ফলে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে কোন মাধ্যমটি কোন রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। অনেক সময় মানুষ তাই সংবাদ পড়া বা দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

(২) আর একটি সংশয়ের জায়গা হল অর্থের কাছে গণমাধ্যমের সমর্পণ।

(৩) কোনো সংবাদ বা বিষয়কে ঘিরে গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা এমন বাড়াবাড়ি ও সাজানো বিষয়ের দিকে চলে যায় যা সাধারণ পাঠক, শ্রোতা বা দর্শকের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

(৪) বর্তমান দিনে গণমাধ্যমগুলিকে সস্তা বিনোদনের উপাদান হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। এগুলির শিক্ষা ও সংস্কারমূলক ভূমিকা ক্রমে সংকুচিত হয়ে আসছে।

(৫) গণমাধ্যমগুলির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয় যে তারা একই বিষয়কে বারবার পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মানুষের চিন্তাশক্তিকে তাদের সেট করা পথে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

(৬) গণমাধ্যমগুলি মূলত একমুখী মতামত প্রকাশ করে।

(৭) গণমাধ্যমগুলি মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার, মানবিক মুখ প্রদর্শন-এই সকল ভূমিকা কতটা পালন করে তা দিয়ে সন্দেহ আছে। যেমন, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে গায়ে আগুন লাগানোর পর কাউকে বাঁচানোর পরিবর্তে তার ফুটেজ তোলাতে বেশি আগ্রহী হয়ে পরে।

(৮) বর্তমানের গণমাধ্যম গণতন্ত্র রক্ষা কিংবা আধুনিকতা তৈরিতে কতটা দায়িত্বশীল সে প্রশ্নও রয়েছে। রাজনৈতিক সংবাদ মানেই কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা করা , তার আধুনিকতার স্থলে উত্তর আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া — এই ভূমিকাই বেশি চোখে পড়ে।

পরিশেষে বলা যায়, গণমাধ্যম ব্যক্তিমাত্রেরই পছন্দের বিষয়। তা যদি পক্ষপাতদুষ্ট, বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। যদি ব্যাপক জনমানুষের কল্যাণের বিষয়টি তার মধ্যে প্রকট না হয়। সাংবাদিক যদি তার পেশাদারিত্বের জন্য নীতিবোধ থেকে সরে আসে, সে মাধ্যম জনমানসে বেশিদিন স্থায়ী হয় না বা জনগণ তাকে ক্ষমা করে না।

SOCIOLOGY

2017

বিভাগ -খ

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখো। (1×16)

(i) চরম ও আপেক্ষিক দারিদ্রের মধ্যে একটি পার্থক্য লেখো।

উঃ চরম দারিদ্র ঃ- একজন ব্যক্তি যখন তার নিজের ও তার ওপর নির্ভরশীল পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রাথমিক দৈহিক চাহিদাসমূহ, যেমন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি, পূরণে অসমর্থ হয়, তখন তার সেই অবস্থাকে চরম দারিদ্র বলা হয়।

আপেক্ষিক দারিদ্র ঃ- কোনো ব্যক্তি তার সমাজের অন্যান্যদের তুলনায় দরিদ্র অর্থাৎ অন্যান্যদের জীবনযাত্রার তুলনায় তার জীবনযাত্রার মান নিম্নে অবস্থিত, তখন তার সেই অবস্থাকে আপেক্ষিক দারিদ্র বলে।

অথবা

সন্ত্রাসবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদের একটি করে উদাহরণ দাও ঃ

উঃ সন্ত্রাসবাদ ঃ- ২০০১ সালের ১৩ই ডিসেম্বরের দিল্লি সংসদ ভবন আক্রমণ

আঞ্চলিকতাবাদ ঃ- ২০০২ সালের ১৫ই নভেম্বরে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন। এবং ২০০০ সালের ১লা নভেম্বর ছত্তিশগঢ় রাজ্য গঠন।

(ii) লোকপাল বিল কি কারণে লোকসভায় উপস্থাপিত করা হয়েছে?

উঃ ভারতবর্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যকরী বিল হিসাবে আইনত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য লোকপাল বিলটি লোকসভায় উস্থাপিত করা হয়েছে।

অথবা

ICDS প্রকল্পটি চালু করার কারণ কি?

৬ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে এই শিশুবিকাশ প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

(iii) জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য কী ছিল?

উঃ জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল ''পূর্ণ সাক্ষরতা বা Total Literacy এবং লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে ধরা হয় ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৮০ মিলিয়ান ব্যক্তি (১৫ থেকে ৩৫ বছর) যারা নিরক্ষর তাদেরকে ব্যাবহারিক সাক্ষরতা বা Functional literacy প্রদান করা''।

(iv) ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে জি. কে. গোখলের অন্যতম প্রচেষ্টা কি ছিল?

উঃ ৬-১০ বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(v) সমাজতত্ত্বে রণজিৎ গুহর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা কী?

উঃ রণজিৎ গুহ নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রথাগত যাত্রার প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থ Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India. –এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

অথবা

ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর কোন্ গ্রন্থে পুঁজিবাদের বিকাশের ধারনা ব্যাখ্যা করেছেন?

উঃ ''The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism (1904)" গ্রন্থে ম্যাক্স ওয়েবার পুঁজিবাদের বিকাশের ধারণা ব্যাখ্যা করেছেন।

(vi) নারীশিক্ষা বিস্তারে বিদ্যাসাগরের অবদান লেখো।

উঃ ১৮৪৯ সালে মে মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করেন। এরপর ভারত সরকার ১৮৫৮ সালের পর ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয়গুলির আর্থিক দায়ভার অস্বীকার করলে তিনি নিজেই 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' গঠন করে চাঁদা সংগ্রহ করে সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। এছাড়া ১৮৫৭ সালে জৌগ্রামে নিজে একটি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

(vii) কোন্ কোন্ ধরনের পরিবারকে উৎপাদনশীল একক এবং ভোগ একক বলে?

উঃ **যৌথ** পরিবারকে উৎপাদনশীল একক বলে।

একক পরিবারকে ভোগ একক বলে।

(viii) গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে কে ছিলেন?

উঃ গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে (১৮৯৩-১৯৮৩) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের প্রথম ভারতীয় অধ্যাপক যিনি লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্স থেকে সমাজতত্ত্ব পড়ে এসেছিলেন এল. টি. হবহাউস-এর ছাত্র হিসাবে। তাঁর চেষ্টায় Indian Socioligical Society-র মুখ পত্র Sociological Bulletin 1920 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

অথবা

''ভারততত্ত্ব''কে ''The book view" কে বলেছেন?

উঃ এম. এন. শ্রীনিবাস 'ভারততত্ত্ব'-কে ''The book view" বলেছেন।

(ix) হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫-এর গুরুত্ব কি?

উঃ হিন্দু বিবাহ আইন, ১৯৫৫ সালের ১৮-ই মে তারিখে বলবৎ হয়। এই আইন দ্বারা বহুগামিতা বন্ধ করা হয়। এছাড়া নারীদের বিয়ের ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়স ১৮ করা হয়েছে।

(x) ভারতীয় যৌথ পরিবারের একটি নেতিবাচক দিক লেখো।

উঃ যৌথ পরিবারে **Privacy** বা **গোপনীয়তা** বজায় রাখা অতটা সম্ভব হয় না।

(xi) বিবেকানন্দ ধর্ম প্রসঙ্গে যে যোগের কথা বলেছেন, তা কয়টি স্তরে বিভাজিত?

উঃ বিবেকানন্দ ধর্ম প্রসঙ্গে প্রধান চারটি যোগের কথা বলেছেন— **কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ।**

অথবা

"কর্মযোগ" বলতে কি বোঝ?

উঃ স্বামী বিবেকানন্দের মতে '**কর্মযোগ**' হল, যে পদ্ধতিতে মানুষ তার কর্ম এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে নিজের দেবত্বকে উপলব্ধি করেন।

(xii) "Education is the Socialization of younger generation" কথাটি কে বলেছেন?

উঃ "Education is the Socinlization of younger generation" কথাটি ডুরখেইম বলেছেন।

(xiii) এম. এন. শ্রীনিবাসের মতানুসারে ভারতবর্ষে পাশ্চাত্তকরণের কারণ কী?

উঃ শ্রীনিবাসের মতে ভারতীয়দের মধ্যে সনাতনী সমাজ পরিবর্তনের একটি ইচ্ছা এবং শক্তিকে জাগ্রত করতে ভারতে পাশ্চাত্তকরণ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রদায় ভিত্তিক চেতনা থেকে মুক্তি এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে সনাতনী সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের চেষ্টা সবই সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্তকরণের ফলে।

অথবা

'ধর্মনিরপেক্ষতা' বলতে কী বোঝ?

উঃ 'ধর্মনিপেক্ষতা' হল সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন যা সমস্ত রকম ধর্মীয় বিশ্বাসকে ত্যাগ করে। ভারতবর্ষের মতো দেশে, রাষ্ট্রের কাজকর্মের ব্যাপারে ধর্মীয় প্রভাব থাকবে না, রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্ম ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতাদর্শ প্রসারের জন্য তার সরকারি ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে না। রাষ্ট্রের চোখে সকল ধর্মই সমান মর্যাদা সম্পন্ন।

BPL কথাটির পূর্ণ রূপটি লেখো।

উঃ BPL- Below Poverty Level or Line.

(xv) মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত জনগণকে কি বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন?

উঃ মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্য হিসেবে চিহ্নিত জনগণকে 'হরিজন' (Children of god) বলে সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

অথবা

ব্যক্তি মানুষের ত্রিবিধ রূপান্তর নিয়ে কে আলোচনা করেছেন ?

উঃ ব্যক্তি মানুষের ত্রিবিধ রূপান্তর নিয়ে ঋষি অরবিন্দ আলোচনা করেছেন।

(xvi) প্রাক্‌ব্রিটিশ ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজে জমির বাস্তব মালিক কে ছিল?

উ ঃ প্রাক্‌ব্রিটিশ ভারতে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজে জমির বাস্তব মালিকানা যৌথ ছিল।

অথবা

আধুনিকীকরণের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ আধুনিকীকরণের দুটি বৈশিষ্ট্য হল—

(a) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য - অর্থনৈতিক ভূমিকার বিশেষীকরণ।

(b) রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য - শাসকবর্গের নৈতিক আদর্শ রূপায়ণের বাধ্যবাধকতা।

2017

বিভাগ - খ

2. **বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ-** **1×24**

(i) জলসম্পদ সংরক্ষণ কার সঙ্গে সম্পর্কিত

(a) গোলাপী বিপ্লব (b) নীল বিপ্লব

(c) সবুজ বিপ্লব (d) (b) ও (c) উভয়ই (b)

(ii) JNNURM প্রকল্পটি ———————— দূরীকরণের সাথে জড়িত

(a) দারিদ্র (b) সাম্প্রদায়িকতা

(c) দুর্নীতি (d) আঞ্চলিকতাবাদ (a)

(iii) নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চর্চার ধারণাটি এসেছে ———————— -এর রচনা থেকে।

(a) রণজিৎ গুহ (b) পার্থ চট্টোপাধ্যায়

(c) গৌতম ভদ্র (d) আন্তোনীও গ্রামসি (d)

(iv) বল প্রয়োগ বা হিংসাত্মক ঘটনা ঘটিয়ে সমাজ বা সরকারকে প্রভাবিত করার সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে বলে—

(i) অধিক জনসংখ্যা (b) আঞ্চলিকতা

(c) সন্ত্রাসবাদ (d) দুর্নীতি (c)

(v) IMR-এর পূর্ণরূপ হল—

(i) ইণ্ডিয়ান মর্টালিটি রেট

(b) ইনফ্যান্ট মর্টালিটি রেট

(c) ইনফ্যান্ট মরালিটি রেট

(d) এদের কোনোটিই নয় (b)

(vi) ''ভারতে যতগুলি সন্ত্রাসবাদের ঘটনা ঘটেছে তার বেশিরভাগই আঞ্চলিকতাবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত।'' এই বিবৃতিটি

(a) ঠিক (b) ভুল

(c) অস্পষ্ট (d) অজানা (a)

(vii) IRDP———— পুর্ণগঠনের সঙ্গে যুক্ত।

(a) গ্রামীণ কাঠামো (b) মহানগর

(c) শহর (d) নগরীয় কাঠামো (a)

(viii) ২০১১-এর আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতবর্ষে নারী ও পুরুষের আনুপাতিক হার হল—

(a) 770:1000 (b) 900:1000

(c) 940:1000 (d) 1010:1000 (c)

(ix) "Social Change in Modern India" গ্রন্থে ———— ধারণাটি পরিমার্জিত হয়।

(a) ব্রাহ্মণ্যকরণ (b) নগরায়ণ

(c) পাশ্চাত্তায়ন (d) সংস্কৃতায়ন (d)

(x) বর্তমান ভারতে কোন্‌টি শ্রেণি কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত নয়?

(a) পুঁজিপতি (b) কৃষক

(c) মহাজন (d) শ্রমিক (c)

(xi) "Drain of Wealth" তত্ত্বটি যার নামের সাথে জড়িত তিনি হলেন

(a) হারবার্ট রিসলে (b) দাদাভাই নওরোজি

(c) ব্রজেন্দ্র শীল (d) স্যার প্যাট্রিক গেডেস (b)

(xii) বৈদ্যুতিক টাকার ধারনাটি———— -এর সাথে জড়িয়ে আছে।

(a) উদারীকরণ (b) বিশ্বায়ন

(c) আধুনিককীকরণ (d) পাশ্চাত্তায়ন (b)

(xiii) ''মানুষ গড়াই আমার লক্ষ্য'' বলেছিলেন

(a) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

(b) অববিন্দ

(c) বিবেকানন্দ

(d) গোখলে (c)

(xiv) ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায়———— ধারণাটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

(a) গণতান্ত্রিক (b) সাধারণতন্ত্র

(c) সার্বভৌম (d) ধর্মনিরপেক্ষ (d)

(xv) গ্রীনহাউস এফেক্ট ————————-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

(a) বায়ু দূষণ (b) জলদূষণ

(c) মৃত্তিকা দূষণ (d) শব্দ দূষণ (a)

(xvi) 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ করেন

(a) মহাত্মা গান্ধী (b) জি. কে. গোখলে

(c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (d) বিদ্যাসাগর (a)

(xvii) ভারতে ———— প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহভোক্তা।

(a) শ্রেণি (b) জাতি

(c) উপজাতি (d) সিডিউলড্ কাস্ট (b)

(xviii) ঋষি অরবিন্দ———————— -এর সাথে যুক্ত ছিলেন।

(a) ডিভাইন লাইফ (b) থিওসফিক্যাল সোসাইটি

(c) আর্থ লাইফ (d) সত্যশোধক সমাজ (a)

(xix)প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে যজমানি প্রথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল–

(a) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা

(b) ব্যক্তিগত আন্তঃমানবিক সম্পর্ক

(c) বংশ পরম্পরা প্রবাহিত

(d) উচ্চ নীচ মর্যাদাবোধ (a)

(xx) সংস্কৃতায়ন ধারণাটি প্রবর্তন করেন

(a) এম. এন. শ্রীনিবাস (b) অমিতাভ ঘোষ

(c) বিনয় কুমার সরকার (d) এঁদের কেউ নন (a)

(xxi) ভারতে সমাজতত্ত্বের সূত্রপাতে ১৮৬৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

(a) বেথুন সোসাইটি (b) বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা

(c) এশিয়াটিক সোসাইটি

(d) ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি (b)

(xxii) মূলত————————এর অভিমতকে অনুসরণ করে একদল সমাজবিজ্ঞানী প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

(a) হেনরি মেইন (b) বতেন পাওয়েল

(c) মেট কাফ্ (d) মার্ক্স (a)

(xxiii) ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদদের মধ্যে যারা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীকে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন—

(a) এম. এন. শ্রীনিবাস (b) বিনয় কুমার সরকার

(c) এ. আর. দেশাই (d) ডি. এন. ধনাগরে (c)

(xxiv) কোনটি ভিন্ন তা উল্লেখ করো ঃ

(a) দি পজিটিভ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ হিন্দু সোসিওলজি - বিনয় কুমার সরকার।

(b) রুরাল সোসিওলজি ইন ইন্ডিয়া - এ. আর. দেশাই।

(c) কিনসিপ অরগ্যানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া - এস. সি. দুবে।

(d) কাস্ট অ্যাণ্ড রেস ইন ইন্ডিয়া - জি. এস. ঘুরে। (c)

SOCIOLOGY

2018

বিভাগ -ক

1) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাওঃ **8×5**

a. দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়? এ বিষয়ে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের ভূমিকা আলোচনা করো। **3+5**

উঃ **দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ঃ-** আধুনিক সমাজতত্ত্বের আলোচনায় দৃষ্টিভঙ্গি বলতে সাধারণভাবে কোনো বিষয়ের ওপর সুনির্দিষ্টভাবে আলোকপাত বা বিশ্লেষণ ধারাকে বোঝায়। অপরদিকে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্ববাদ বলে। সামাজিক বাস্তবতার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বমূলক প্রেক্ষিত বিশেষভাবে অর্থবহ।

'Dialectic'-এই ইংরাজি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Dialogo' থেকে যার অর্থ হলো 'আলাপ-আলোচনা' বা 'তর্ক-বিতর্ক'। দুটি পরস্পরবিরোধী শক্তির সংঘাতজনিত প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্ববাদ বা দ্বান্দ্বিকতা বলে। এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কথা প্রথম বলেন ভাববাদী জার্মান দার্শনিক হেগেল। হেগেলের মত অনুসারে সবকিছুর বিকাশ তার অন্তর্নিহিত দ্বান্দ্বিকতার ফলেই ঘটে থাকে।

ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজ ধারাবাহিকতার ইতিহাস পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন পন্থা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সমাজ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের নিরিখে সমাজ বিশ্লেষণের যে ধারা বা পদ্ধতি সমাজতাত্ত্বিকরা অনুসরণ করেন তাকেই বলা হয় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যে প্রত্যয় বা উপলব্ধি থেকে অর্থনৈতিক ঘটনা পরম্পরাকে গুরত্ব দিয়ে সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস নির্ণয় করে সেই দৃষ্টিকোণেরই অন্য নাম দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি । মার্কসীয় দৃষ্টিতে এই বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহের মূলে আছে দ্বন্দ্ব। প্রকৃতির প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। তাই প্রকৃতিরাজ্যে যেমন ঐক্য আছে, তেমনি পরিবর্তনও আছে। কোনো বিষয় সম্পর্কে Thesis, Antithesis এবং Synthesis (বাদ, প্রতিবাদ, সম্বাদ) অহরহ চলতেই থাকে, তার ফলেই আসে পরিবর্তন। মার্কসের বিশ্লেষণে উঠে আসে প্রকৃতিতে যেমন দুটি বিষয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে, তেমনি সমাজের মূল্যবোধেও দুটি বিপরীত শ্রেণির দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে-সে দ্বন্দ্ব 'আছে' (Haves) আর 'নেই' (Have nots)-এর, এই দুই শ্রেণির সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সূচিত হবে পরিবর্তন-শ্রেণিহীন সমাজ।

- **ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের ভূমিকা ঃ** ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচিত্র। মার্কসীয় দর্শনকে সামনে রেখে বলা যায় ভারতবর্ষেও ক্রীতদাস প্রথা ছিল; ছিল শোষন ও অত্যাচার।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক যারা মার্কসীয় দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজকে দ্বন্দ্বের নিরিখে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, ভারতবর্ষের পটভূমিকায় নিজেদের মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের মধ্যে প্রথমে বাঙালি চিন্তাবিদ হলেন গোপাল হালদার, যার হাত ধরে ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে প্রথম দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। তিনি তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস দ্বান্দ্বিক ছাঁচে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এরপর ১৯৪৮ সালে ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'Modern Indian Culture—A Sociological Study' গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাস রেখেছেন। তিনি মনে করেন যে অর্থনৈতিক শক্তি যা দ্বান্দ্বিক তত্ত্বকে মেনে চলে তা-ই ভারতীয় সমাজ গঠনের প্রধান হাতিয়ার।তাঁর মত ছিল-''অপেক্ষাকৃত পুরোনো মার্কসবাদই হলো সেই দর্শন যাতে সামগ্রিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জনসাধারনের বাস্তুতান্ত্রিক উন্নতির কথা বলা হয়েছে। এই মার্কসবাদের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে সভ্যতার পরবর্তী উচ্চস্তরে বা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ওই সময়ে ও পরবর্তী সময়ে যে সকল ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক মার্কসের দ্বান্দ্বিক সমাজতত্ত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় সমাজ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের জন্য অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ডি. ডি. কোসাম্বী, আর. আর ভান্ডেকার, এ.আর.দেশাই, কে. এম কাপাডিয়া, মানবেন্দ্র রায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, আন্দ্রে বেতাই প্রমুখ। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ''Studies in Indian Social Polity'' গ্রন্থে ভারতীয় সমাজের বিষয়ে মার্কস ও ওয়েবারের আলোচনাকে গভীরভাবে পরীক্ষা করেছিলেন। ডি. ডি. কোসাম্বীর দৃষ্টিতে শ্রেণিগত বিচারে ভারতীয় সমাজের ইতিহাস হলো উৎপাদনের উপকরণ। তাঁর মতে উৎপাদন সম্পর্কে সম্পর্কিত মতবাদ এবং আন্দ্রে বেতাই-এর ভারতবর্ষের সামাজিক স্তরবিন্যাসের প্রকৃতি ও গ্রামীণ কৃষক সমাজের গড়ন ও পরিবর্তন বিষয়ক রচনায় দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে।

আধুনিক কালে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সূত্রপাত ঘটে বিপ্লবী মানবেন্দ্র রায়ের হাত ধরে। তিনি ১৯২০ সালের ১৭ ই অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসকন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন। রচনা করেন ''New Humanism বা নব্য মানবতাবাদ'' নামে একটি গ্রন্থ যেখানে তিনি ইতিহাস-দর্শন-রাজনীতি—সংস্কৃতি এসব কিছুকে সামগ্রিক কাঠামো দান করেন।

তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মার্কসবাদী শাসনের অবসান, সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি, মার্কসীয় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক, সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশে অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি নানবিধ কারণে সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা বা সামাজিক ঘটনা বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতাত্ত্বিকগণ অনেকখানিই বিচ্যুত।

অথবা

ভারতবর্ষে নিম্নবর্ণের ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো। ভারতবর্ষে সমাতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা লেখো। 3+5

উঃ 'Sub-altern' কথাটি প্রথম এসেছে ইতালিয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্তেনিয়ো গ্রামশির রচনা থেকে। এই কথার দ্বারা সমাজের সেই সকল নীচু স্তরের মানুষদের বোঝানো হয় যারা শ্রেণি, জাতি, ভাষা ও লিঙ্গগত দিক থেকে অন্যদের অধীন। তাই এদের নিম্নবর্গীয় বলে মনে করা হয়।

১৯৮২ সালে ভারতবর্ষে নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার প্রথাগত যাত্রা শুরু হয়। এর প্রধান উদ্যোক্তা রণজিৎ গুহ। এর সাথে যুক্ত আছেন গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম ভদ্র, দীনেশ চক্রবর্তী, সুমিত সরকারের মতো বাঙালি গবেষকগণ।

সত্তর দশকের ভারতে মার্কসবাদী রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিতর্কের মধ্যে দিয়েই Sub-altern studies এর সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা– কোনটা প্রচলিত রয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে ক্ষমতা বিন্যাস না সামাজিক প্রগতি কোনটা বিচার্য ছিল এই বিষয় নিয়ে অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকগণদের মধ্যে দেখা দিল নানা বিতর্ক। রাজনীতিকগণও ১৯৬৭ নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলনের ব্যর্থতা নিয়ে বিতর্কে অগ্রসর হলেন।

এইসকল অসম্পূর্ণ বিতর্কের মাঝেই এই ইতিহাস চর্চায় আগ্রহী ব্যক্তিগণ, নিম্নবর্গের মানুষজনের ঐতিহাসিক চেতনা, তাঁদের কর্মের স্বীকৃতি যা দীর্ঘদিন উপনিবেশিক ভারতে এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও উপেক্ষিত ছিল তা নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তাঁরা একটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিম্নবর্গের মানুষের ইতিহাস পাঠ করলেন। তাঁরা মনে করেন আধুনিক সমাজের পরিচিত নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ কাঠামোর দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষদের বিশ্লেষণ যথাযথ হবে না, কারন তাঁদের সমাজে জড়িয়ে রয়েছে জাতিভেদ প্রথা, প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি, সাম্প্রদায়িকতা, রক্ষণশীলতা, অর্থনীতির সামগ্রিক অনুপস্থির মতো বিষয়গুলি।

- **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ঃ** বিষয় হিসেবে সমাজতত্ত্বের অর্ন্তভূক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই বিষয়টির পঠন-পাঠন চলতে থাকে। তবে ঠিক কবে থেকে এ বিষয়টি পড়ানো শুরু হয় তা পরিষ্কার নয়। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপিকা ড: বেলা দত্তগুপ্তর মতে, ১৯০৮ সাল থেকে। তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক অর্থনীতি বিভাগে সমাজতত্ত্ব বিষয়ক দুটি পত্র পড়ানো হতো। আর একটি সূত্রে, অধ্যাপক বিনয় কুমার

সরকার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক। শ্রী সরকার (১৮৮৭-১৯৪৯) ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম অর্থনীতি বিভাগে যোগদান করেন। তবে স্নাতকোত্তর বিভাগটি স্বতন্ত্রভাবে চালু হয়েছে ১৯৭৫/৭৬ সালে। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার ছিলেন জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো-The Positive Background of Hindu Sociology. এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক সরকারের পর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন অধ্যাপক রাধাকমল মুখার্জী। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং আজীবন সেখানেই অধ্যাপনা করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে যিনি এই বিষয়টির গুরুত্ব প্রচারে একনিষ্ঠ ব্রতী হন তিনি অধ্যাপিকা বেলা দত্তগুপ্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, Indian Statistical Institute, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ড: প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, তাঁকেও ভারতীয় সমাজতত্ত্বের বিকাশের অন্যতম কাণ্ডারী বলা হয়। তাঁর অনেক ছাত্র-ছাত্রীও এই কাজে ব্রতী ছিলেন, যাঁদের মধ্যে স্মরনীয় হলেন রামকৃষ্ণ মুখার্জী, ধুর্জটিপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ।

b. স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। যজমানি প্রথা ভেঙে পড়ার কারণ কী?

উঃ উপরের প্রশ্নের প্রথম অংশের মডেল উত্তরের জন্য ২০১৬ সালের বিভাগ-'ক' এর 1.b) দেখতে হবে।

- **যজমানী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ ঃ** প্রাক-ব্রিটিশ স্বনির্ভর গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে পেশাভিত্তিক সেবা ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দাতা গ্রহীতার পারস্পরিক বংশ পরম্পরাগত ব্যবস্থাই হলো যজমানী প্রথা। এই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল দীর্ঘস্থায়ী। যজমানী ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণগুলি হলো—

  (i) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন—গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ঘটেছে পরিবর্তন, তাই যজমানী ব্যবস্থা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে।

  (ii) **শিল্পায়ন ঃ** শিল্পায়ন, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ-এর বিকাশ সাবেকি জাত ব্যবস্থাকে করেছে দুর্বল। যার সাথে যজমানী ব্যবস্থাও হীনবল হয়ে পড়েছে।

  (iii) **বাজার অর্থনীতি ঃ** বাজার অর্থনীতি যজমনী অর্থনীতির পরিপন্থী।

  (iv) **শিক্ষার বিস্তার ঃ** শিক্ষার বিস্তার ও মানুষের সচেতনতা যজমানী ব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে।

  (v) **গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা ঃ** রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার প্রভৃতি রাজনৈতিক পরিবর্তন যজমানী সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছে।

(vi) **সাবেকি জাত ব্যবস্থার অবক্ষয় ঃ** হিন্দু সমাজে জাত ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বৃহত্তর সমাজ জীবনে পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরিমণ্ডলের মধ্যে যজমানী ব্যবস্থা নিতান্তই বেমানান হয়ে পড়েছে।

(vii) **আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঃ** আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে সমাজে ধর্মবিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে। সামাজিক জীবনে এসেছে পরিবর্তন, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যজমানী ব্যবস্থার অবক্ষয় ঘটিয়েছে।

(viii) **পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঃ-** পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার যজমানী ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার অপর একটি কারণ।

অধ্যাপক রাম আহুজার মতে, ''Because of all these factors, the Jajmani System has been largely supplanted in many villages while in some it has completely disappeared".

c. বর্তমান ভারতের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করো। 8

উঃ ভূমিকা ঃ বর্তমান দিনে গ্রাম ও শহরের সেই পার্থক্য অনেকখানি কমে এসেছে। নগরায়ণের হাত ধরে গ্রামীণ জীবনের উপর নগর জীবনের প্রভাব প্রবলভাবে দেখা যাচ্ছে। ফলে এই দুটির মধ্যে পার্থক্যসূচক বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে বিলীন হওয়ার পথে।

শ্রেণিসমূহ ঃ তাই সম্পূর্ণ ভারত সমাজকে মানদণ্ড ধরে নিয়ে আমরা আধুনিক ভারতে যে যে শ্রেণির অবস্থান দেখতে পাই সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) পুঁজিপতি শ্রেণি ঃ

এই শ্রেণির লোকজন বড়ো বড়ো কলকারখানা, শিল্পসংস্থার মালিক। এদের অবস্থান মূলত নগরকেন্দ্রিক, দেশের অর্থনীতির নিয়ামক এই শ্রেণি; এরা সরকারের সাথে একযোগে দেশের অর্থনৈতিক শিল্প বাণিজ্য নীতি স্থির করে। লাভ খোঁজার অত্যধিক চেষ্টা এদের মধ্যে থাকলেও বর্তমানে শ্রমিক শোষন বিষয়টি অতটা নেই কারণ শ্রমিকের স্বার্থে বহু আইন প্রণয়ন হয়েছে।

(খ) শাসক শ্রেণি ঃ

ভারতীয় গণতন্ত্রে এরা শাসন ক্ষমতা লাভ করে, দেশ চালানোর কাজ করে থাকে। এরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির লোক। কখনো বিধায়ক-সংসদ-মন্ত্রী হিসাবে, আবার কখনো বিরোধী পক্ষ হিসাবে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে। এদের সম্পর্কে দুর্নীতিগ্রস্ততা, নীতিহীনতা, লোকঠকানো প্রভৃতি বিস্তর অভিযোগ সময়ে সময়ে তৈরি হয়।

(গ) আমলা শ্রেণি ঃ

আমলা কথাটির আক্ষরিক অর্থ আমলাতন্ত্র বা 'টেবিল শাসন ব্যবস্থা'র অন্তর্গত লোকজন। সরকারি শাসনযন্ত্রে ক্রমবিন্যাসের ধাপে ধাপে অবস্থিত সকল সরকারি কর্মী ও আধিকারিকগণ এই শ্রেণিভুক্ত। এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবার বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যেগুলি আজও প্রাসঙ্গিক। এরা সরকারের নীতি ও কর্মসূচির রূপায়ণকারী।

(ঘ) বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ঃ

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে এই শ্রেণি যথেষ্ঠ সক্রিয়। বিভিন্ন পেশায় যুক্ত লোকজন থেকে শুরু করে, স্বনির্ভর ব্যক্তিবর্গ যারা সাহিত্য-ক্রীড়া-শিল্পকলা সংস্কৃতির অন্যান্য দিকগুলির সাথে যুক্ত তারা এই শ্রেণিভুক্ত। এরা সামাজিক সমস্যায় একজোট হয়ে প্রতিবাদ করেন। এরা কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের প্রতীক।

(ঙ) কৃষক শ্রেণি ঃ

গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় ৬৫% মানুষই কৃষক। তারাই দেশ ও জাতির খাদ্য উৎপাদক শ্রেণি। বর্তমানে নতুন প্রযুক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রভৃতির হাত ধরে তাদের উৎপাদন একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মানদণ্ডে এসে পৌঁছেছে। আজও গ্রামীণ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের ধারক ও বাহক হয়ে আছেন এই কৃষক শ্রেণি।

(চ) শ্রমিক শ্রেণি ঃ

শারীরিক শ্রমক্ষমতাকে বিক্রি করে দেশের সবচেয়ে বড়ো শ্রেণিরূপে অবস্থান এদের। অশিক্ষা, অজ্ঞতা, শোষণ, বঞ্চনা, পরিশ্রম, মালিকের দাক্ষিণ্য—এই উপাদানগুলি এই শ্রেণির সাথে সংযুক্ত। তবুও আগের চেয়ে এদের অবস্থা অনেক ভালো হয়েছে। বর্তমানে এই শ্রেণি কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, অন্যান্য ক্ষেত্র ধরে জীবিকা নির্বাহ করে।

(ছ) ব্যবসায়ী শ্রেণি ঃ

দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ সঞ্চালনে যুক্ত ব্যক্তিবর্গই ব্যবসায়ী। খুচরো দোকানদার থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক আমদানি রপ্তানি কারবারীরাও এই শ্রেণির অন্তর্গত। কালোবাজারি, ভেজাল, ব্রান্ড নকল করা প্রভৃতি বিষয়গুলি এদের সাথে যুক্ত।

উপরিউক্ত শ্রেণিগুলি ছাড়াও কর্পোরেট জগতের কর্মচারী, স্বনির্ভর লোকজনকে কেন্দ্র করে পৃথক পৃথক শ্রেণি গড়ে ওঠার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। আসলে নগরায়ণ, বিশ্বায়নের হাত ধরে সমাজজীবনে নানা বিষয়ের প্রবেশ শ্রেণিবিভাজনের চিরাচরিত মানদণ্ডগুলিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে নতুন করে শ্রেণিবিভাজনের মাপকাঠি তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। আর তাতেই ধরা পড়ছে নতুন নতুন শ্রেণির অস্তিত্ব।

অথবা

জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণে মহাত্মা গান্ধির ভূমিকা আলোচনা করো। **8**

উঃ **ভূমিকা ঃ** জাতির জনক, সফল শিক্ষাবিদ, ভারতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি গুজরাটের পোরবন্দরে ১৮৬৯ সালের ২রা অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই জীবের প্রতি অহিংসা, নিরামিষ ভোজন, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয় অনুশীলন করতে থাকেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিরোধী ভূমিকা ঃ ১৮৯৩ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত গান্ধিজির কর্মজীবন ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। সেখানে তখন প্রায় দেড় লক্ষ ভারতীয় নাগরিক ও শ্রমিক থাকত, যারা ব্রিটিশ শ্রেণির দ্বারা অত্যাচারিত হতো। গান্ধিজি একটি মামলার কারণে প্রিটোরিয়ায় গিয়ে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান এবং নিজেও অত্যাচারিত হন। ১৮৯৪ সালে তিনি সেখানে নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানকার ভারতীয়দের রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করেন। বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শেষপর্যন্ত দক্ষিন আফ্রিকার জেনারেল ইয়ান ক্রিশ্চিয়ান স্মুট গান্ধির সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হন।

ভারতে ফেরা ও জাতিভেদ-এর সুফল বিশ্লেষণ ঃ

ভারতে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী থাকলেও এই প্রথার মাধ্যমে এক শ্রেণির মানুষকে ঘৃণা করে অস্পৃশ্য করে রাখার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা ঃ মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্যতাকে ভগবান ও মানুষের প্রতি কৃত অপরাধ হিসেবে দেখেছেন। তিনি অস্পৃশ্য হিসাবে চিহ্নিত জনগণকে 'হরিজন' রূপে সম্মাননা দেখিয়েছেন। এছাড়াও তিনি বিশ্বাস করতেন-নিচু জাতির লোকজন যদি তাদের কাজগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে পারেন, তবে উচ্চজাতির লোকজন বাধ্য হবে তাদের উচ্চ আসনে বসাতে।

জাতি ও রাজনীতির বিরোধিতা ও 'হরিজন' কল্যাণ ঃ সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা সিদ্ধান্ত অনুসারে হরিজনদের পৃথক ব্যবস্থা রহিতকরণের জন্য, ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজি আমরণ উপবাস শুরু করেন। ২৬ সেপ্টেম্বর সরকার তাঁর দাবি মেনে নিলে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি হরিজনদের কল্যাণার্থে 'হরিজন সেবক সংঘ' স্থাপন করেন। এই সালেই ইংরাজি ও হিন্দিতে সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। ওই বছর অন্য কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচি শেষে ৭ই নভেম্বর থেকে হরিজন উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। তিনি ২৬ অক্টোবর ভারত পল্লী শিল্প সমিতি উদ্বোধন করেন। এরপর ১৯৪২ সালের ১৮ই জানুয়ারি থেকে তিনি হরিজন ও অন্যান্য পত্রিকার সম্পাদনার কাজ শুরু করেন। কর্মময় জীবনের অন্যান্য কীর্তিসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর এই হরিজন আন্দোলন।

মানব কল্যাণের বার্তা ঃ তিনি বলতেন, ''একজন মানুষের কল্যাণ সমগ্র মানুষের কল্যাণের মধ্যে নিহিত আছে।'' সবাইকে এক করে দেখার জন্য তাঁর আহ্বান- ''আত্মবিচার করো, অজ্ঞতা জয় করো, শুদ্ধ আচরণ করো এবং মানুষে মানুষে ভেদ দূর করো।'' আত্মশুদ্ধির উপায় সম্পর্কে তাঁর কথা-''যে সত্যের সন্ধান করিতে চায়, তাহাকে ধূলিকণা অপেক্ষা নীচু হইতে হয়।''

সর্বোদয় ঃ তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন 'সর্বোদয়'-এর। তাঁর কাছে সর্বোদয়ের অর্থ হলো 'সকলের কল্যাণ'। তাঁর চোখে সর্বোদয় সমাজে ''রাজপুত্র-কৃষক, হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, শ্বেতকায়-কৃষ্ণকায়, সাধু-শয়তান সকলেই সমান।'' তাঁর এই চিন্তার মধ্যে রাজনৈতিক আদর্শ অপেক্ষা সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শ ছিল অনেক বেশি।

জাতির জনক ঃ গান্ধিজি ছিলেন সনাতন ভারত ঐতিহ্যের আধুনিক বিগ্রহ। সত্য-প্রেম-অহিংসার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা তাঁর ব্যক্তিত্বে ছিল অন্যায়ের প্রতি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, স্বাধীনতার আকাঙ্খা। তিনি ছিলেন লাঞ্ছিত মানবতার মুক্তিদূত, ছিলেন গণজাগরণের প্রাণপুরুষ। তিনি আমাদের অন্যতম দেশনায়ক, জাতির জনক।

d. 'শিক্ষা' বলতে কী বোঝো? জি.কে গোখলের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ে আলোচনা করো। 3+5

উঃ শিক্ষা অর্থাৎ 'এডুকেশন' শব্দটির সৃষ্টি হয়েছে একটি ল্যাটিন শব্দ 'এডুকেয়ার' (Educare) থেকে যার অর্থ বড়ো করা বা পালন করা (Bring up) । গ্রিক চিন্তাবিদদের কাছে শিক্ষা হলো সার্বিক বিকাশসাধনের লক্ষ্যে এক সু-সংবাদ্ধ ও সচেতন পদ্ধতি। ডুর্খাইমের কথায় ''Education is the socialization of the younger generation.'' ম্যাকেঞ্জির মতানুসারে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধন বা আত্মোপলব্ধিকেই বোঝায়। জন ডিউই-এর মতে—শিক্ষা হলো ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলার সামাজিক প্রক্রিয়া। ফ্রয়েবেল বলেছেন—মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সম্ভাবনাগুলির উন্মেষ হলো শিক্ষা। রাসেলের মত অনুসারে—মানুষের সৎ-চরিত্র গঠন করাই হলো শিক্ষার উদ্দেশ্য। অন্যদিকে শিক্ষার দুটি অর্থ আছে—একটি সংকীর্ণ অর্থ ও অন্যটি ব্যাপক অর্থ। সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে সচেতনভাবে গৃহীত আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে বোঝায়। সাধারণত বিদ্যালয়ে এ জাতীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। যার সাথে যুক্ত থাকে শিক্ষক, সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম, পরীক্ষা, ফলপ্রকাশ, ডিগ্রিলাভ প্রভৃতি। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য লাভ করে। অন্যদিকে ব্যাপক অর্থে শিক্ষা হলো যা ব্যক্তি অসচেতনভাবে সারাজীবন ধরে গ্রহণ করে থাকে। নিজের অভিজ্ঞতাকে পুর্ণগঠন সমৃদ্ধ করে। এর কোনো সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম বা নিয়ম পদ্ধতি নেই। ম্যাকেঞ্জির মতে, এই শিক্ষা মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটায় যার ফলে সে তার চার পাশ তথা বিশ্বের সাথে তার সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারে।

- **জি. কে গোখলের শিক্ষা চিন্তা বিষয়ক আলোচনা ঃ**

ভূমিকা ঃ ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সুদীর্ঘ ছ'দশক পরে ২০১০ সালের ১ লা এপ্রিল তারিখে 'শিক্ষার অধিকার' আইনটি প্রণীত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন—'আমি আজ যা, তা শিক্ষার জন্যই হয়েছি। আমি চাই ছেলে-মেয়ে নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি শিশু শিক্ষার আলোকে আলোকিত হোক।' এই বক্তৃতার শুরুতেই মনমোহন সিং স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, প্রায় একশ' বছর আগে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে নামে ভারতে এক কৃতী সন্তান বড়লাটের আইনসভায় আবেদন করেছিলেন যে, ভারতীয়দের শিক্ষার অধিকার প্রদান করা হোক।

বাধ্যতামূলক শিক্ষা ঃ ভারতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রবক্তা হিসেবে গোপালকৃষ্ণ গোখলের নাম স্মরনীয়। এ দেশে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের উদ্দেশে তিনি জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০৩ সালেই তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, 'এটা পরিষ্কার যে, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ একটি জাতি কখনই তেমন উন্নতি করতে পারে না এবং জীবনের দৌড়ে অবশ্যই পিছিয়ে পড়ে।'

গোখলে-এর প্রস্তাব ১৯১০ ঃ ১৮৯৯ সালে গোখলে মুম্বাই বিধান পরিষদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। তারপর ১৯০২ সালে তিনি বড়লাটের আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এখানেই তিনি শিক্ষার অধিকারের প্রস্তাব পেশ করেন ১৯১০ সালের মার্চ মাসের ১৯ তারিখে। এই প্রস্তাবে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যপারে সুপারিশ করা হয়। ৬-১০ বছর বয়সী ছেলের জন্য এই সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবটি সহানুভুতির সঙ্গে বিবেচনার ব্যাপারে সরকারের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গোখলে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু বাস্তবে কোনো কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

গোখলে-এর প্রস্তাব, ১৯১১ ঃ ১৯১১ সালের মার্চ মাসের ১৬ তারিখে গোখলে তাঁর প্রস্তাবটি পুনরায় বিল আকারে কেন্দ্রীয় আইন সভায় পেশ করেন। বিলটিকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাদেশিক সরকারের মতামতের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর প্রণীত বিল-এ শিক্ষাসংক্রান্ত যে সুপারিশগুলি রাখেন সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

(ক) ৬-১০ বছর বয়স পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(খ) বাধ্যতামূলক শিক্ষার পাশাপাশি দরিদ্র অভিভাবকদের কথা ভেবে অবৈতনিক শিক্ষার দিকটিও দেখতে হবে।

(গ) অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ২/৩ অংশ বহন করবে সরকার, ১/৩ অংশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

(ঘ) শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়াদির জন্য আলাদা বিভাগ করতে হবে।

আবারও এই বিলটি প্রথমে বাতিল হয়ে যায়। ১৯১২ সালে এই বিলটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯১৭ সালে বোম্বাই প্রাদেশিক আইনসভায় এই বিলের অনুসরণে একটি বিল উপস্থাপিত হয়। ১৯১৮ সালে তা আইনে পরিণত হয়। গোখলের মস্তিষ্কপ্রসূত এই বিলের বাস্তবায়নের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন বিঠলভাই প্যাটেল। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের পৃথকীকরণ, প্রতি বছর শিক্ষাখাতে ব্যয়বরাদ্দ হওয়া—এগুলি ছিল গোখলের বিল-এর পরবর্তী ফলশ্রুতি।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে গোখলের প্রস্তাব গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁর সাথে ব্রিটিশ রাজের উচ্চস্তর পর্যন্ত যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। তিনি এই যোগাযোগের দ্বারা ভারতের তরুণ প্রজন্মকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সরকারি কাজকর্মের সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার ও বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি।

e. বেকারত্ব বলতে কী বোঝ? ভারতবর্ষে বেকার সমস্যার কারণগুলি আলোচনা করো। 3+5

উঃ বেকারত্বের অর্থ ঃ সকল দেশের আর্থনীতিক ব্যবস্থাতেই সাধারণত দুধরনের বেকারত্ব পরিলক্ষিত হয় ঃ (১) ইচ্ছামূলক বেকারত্ব (২) অনিচ্ছামূলক বেকারত্ব। দেশের প্রচলিত মজুরি কাঠামোতে কাজ থাকার অবস্থায়ও কিছু মানুষ কাজ করতে চায় না। এরাই ইচ্ছামূলক বেকার হিসাবে বিবেচিত হয়। বিপরীতক্রমে দেশের প্রচলিত মজুরি কাঠামোতে কাজ করতে আগ্রহী থাকা অবস্থায়ও অনেক মানুষ কাজ পায়না। এদের বলা হয় অনিচ্ছাকৃত বেকার। ইচ্ছামূলক বেকারত্ব কোনো দেশেরই আর্থনীতিক ব্যবস্থায় সমস্যা হিসেবে দেখা দেয় না। কারণ এ রকম ইচ্ছামূলক বেকারের সংখ্যা কোনো দেশেই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। বেকার সমস্যা সম্পর্কিত আলোচনায় মূলত অনিচ্ছামূলক বেকারত্বের কথাই বলা হয়।

বিভিন্ন সংজ্ঞা ঃ- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)(International Labour Organisation)-র সংজ্ঞা অনুযায়ী সপ্তাহে (পাঁচ দিনে) কোনো ব্যক্তি পনেরো ঘন্টা (দু' দিনে) সবেতন কাজে নিযুক্ত থাকলে, সেই ব্যক্তি বেকার হিসাবে বিবেচিত হবে না। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশ সমূহের ক্ষেত্রে এই সংজ্ঞা খাটে না। কারণ উন্নয়নশীল এই সমস্ত দেশে বেকারদের জন্য কোনোরকম জীবনবিমার সরকারি সুযোগ-সুবিধা অনুপস্থিত। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের ভাষ্য অনুযায়ী কোনো নারী বা পুরুষ ছ' মাস কর্মহীন অবস্থায় থাকলে তাকে 'প্রান্তিক বেকার' বলা হবে।

পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কার্ল প্রিব্রাম বেকারত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ শ্রম বাজারে কাজের যোগানের থেকে শ্রমের অধিকতর যোগানের অবস্থাই হলো বেকারত্বের সূচক। সমাজবিজ্ঞানী ফেয়ার চাইল্ড সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ

বিষয়ে বলেছেন—বেকারত্ব হলো জোর করে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে সবেতন কর্মনিয়োগ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ। সাধারনভাবে বলা হয়েছে যে, কাজ করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাই হলো বেকারত্ব। অধ্যাপক পিগো তাঁর Unemeployment শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন ঃ ''Unemployment means unemployment among the wage-earning and in respect of wage work only" সমাজবিজ্ঞানী ডি মেল্লো দিল্লিতে এক বক্তৃতায় বেকারত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ ''Unemployment is a condition in which an individual is not in a state of remunerative occupation despite his desire to do so" অর্থাৎ বেকারত্ব হলো একটি অবস্থা।

• **ভারতের বেকার সমস্যার কারণ ঃ** ভারতে বেকার সমস্যার পিছনে বিবিধ কারণ ক্রিয়াশীল; কতকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কারণ নিম্নে আলোচনা করা হলো—

(১) জনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্রুত হার ঃ দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ -সামগ্রী বিপুল জনসংখ্যার ভরণপোষণের জন্য ব্যয়িত হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে মূলধন সুনির্দিষ্টভাবে বণ্টন করা যায় না। স্বভাবতই কর্মসংস্থান সৃষ্টির হারও প্রতিহত হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে বেকার সমস্যা তীব্রতর হয়।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের কম হার ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের হারের উপর দেশের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা নির্ভরশীল। দেশের আর্থিক প্রগতি ঘটলে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ে এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়।

(৩) শিল্পক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা ঃ ভারতে শিল্পক্ষেত্রে বিবিধ সীমাবদ্ধতা বর্তমান। শিল্পক্ষেত্রের উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। তার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। বিংশ শতাব্দীর সাতের দশক থেকে শিল্পে রুগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে। তার ফলে বেকার সমস্যাজনিত সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৪) অনুসৃত প্রযুক্তি অনুপযুক্ত ঃ ভারতে তুলনামূলক বিচারে শ্রমিক সুলভ এবং মূলধন মহার্ঘ। সুতরাং ভারতে শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করাই যথাযথ। কিন্তু এদেশে শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তির পরিবর্তে শ্রমসাশ্রয়কারী মূলধন নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহার করার প্রবণতা প্রবল। শিল্প ক্ষেত্রে তো বটেই, আজকাল কৃষিক্ষেত্রেও মূলধন নির্ভর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। স্বভাবতই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাচ্ছে। ভারতে মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। তার ফলে অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হচ্ছে, কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা হ্রাস পাচ্ছে।

(৫) জাতীয় কর্মসংস্থানের নীতির অনস্তিত্ব ঃ স্বাধীন ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূত্রপাতের সময় থেকে কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সঠিক নীতি নির্ধারিত বা গৃহীত হয়নি।

মানবসম্পদের সম্যক ও সঠিক ব্যবহারের ব্যাপারে যথাযথ নীতি বা কর্মসূচী নির্ধারিত বা গৃহীত হয়নি। ভারতে বেকারের সংখ্যা বিশাল। কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বিপুল। তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আবশ্যক হলো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। তা কিন্তু গ্রহণ করা হয়নি। স্বভাবতই বেকার সমস্যা ক্রমবর্ধমান।

(৬) শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি ঃ স্বাধীন ভারতের বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ; বিবিধ সীমাবদ্ধতার শিকার। এই শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবতাবর্জিত ও কেতাবি। ভারতীয় অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়নি।

(৭) কৃষি ব্যবস্থার প্রকৃতি-নির্ভরতা ঃ প্রকৃতি-নির্ভরতার কারণে কৃষিকর্মে সারাবছর কৃষিজীবীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় না। তার ফলে কৃষকদের মধ্যে মরসুমি বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে কৃষিকার্যের বাইরে কর্মনিযুক্তির বিকল্প ব্যবস্থা প্রায় অমিল।

অথবা,

দুর্নীতি বলতে কী বোঝো ? দুর্নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো। 3+5

উঃ দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। এই ব্যাধি বিশ্বব্যাপী বর্তমান। মানব সমাজে সবসময় সর্বত্রই কোনও না কোনো দুর্নীতিমূলক ক্রিয়াকর্ম পরিলক্ষিত হয়। আভিধানিক দুর্নীতি হলো ন্যায়নীতি এবং সততা বিরোধী এক প্রকার বিচ্যুত আচরণ। বেআইনি আচরণকে দুর্নীতিমূলক আচরণ বলা হয়। যে কারনে মানুষ এই ধরনের আচরণ করে সেগুলি হলো—

- **ব্যক্তিগত লাভের জন্য ক্ষমতার অব্যবহার ঃ** সকল রকম বিধিবদ্ধ নিয়মকানুনের তোয়াক্কা না করে ব্যক্তিগত লাভ বা সুযোগ সুবিধার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা বা সরকারি পদের ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। এই লাভ আর্থিকভাবে বা অন্য কোনোভাবে হতে পারে।

- **বিভিন্ন সুবিধার জন্য সরকারি ক্ষমতার অপব্যহার ঃ** বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন বা বিদ্যমান আইনকে লঙ্ঘন করে বেসরকারি, ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত লাভ ও সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারি পদ তথা ক্ষমতার অপব্যবহার হলেও দুর্নীতি।

- **অন্যান্য সুবিধার জন্য কর্তব্যের অবহেলা ঃ** দুর্নীতিমূলক আচরণের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যায্য সুযোগসুবিধা অর্জনের অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছায় তার নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদন থেকে বিরত থাকে। সাধারণভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ সরকারী আধিকারিক বা কর্মচারী ক্ষমতার অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে দুর্নীতিমূলক কাজকর্মের সাথে যুক্ত থাকেন।

- **দুর্নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ**

দুর্নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি হলো—

(ক) দুর্নীতি হলো নিয়ম বর্হিভূত, আইন বিরুদ্ধ এবং অনৈতিক ক্রিয়াকর্ম। এই ক্রিয়াকর্ম জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কীত।

(খ) দুর্নীতির সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কযুক্ত। এই ক্ষমতা হলো জনজীবন সম্পর্কীত বা সরকারি পদ সম্পর্কীত।

(গ) দুর্নীতির সঙ্গে ঘুষ দেওয়া নেওয়ার কাজকর্ম বা অভ্যাস যুক্ত। অন্যায়ভাবে কাজ করা বা কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া সবক্ষেত্রেই ঘুষ দেওয়া নেওয়া হয়।

(ঘ) দুর্নীতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো ইচ্ছাকৃতভাবে বিশ্বাসঘাতকতা, যথাযথ দায়িত্ব পালন না করা প্রভৃতি অবৈধ ও অনৈতিক কাজ।

(ঙ) নির্ধারিত যথাযথ দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও দুর্নীতিমূলক। এই অবহেলা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হতে পারে। এই অবহেলা উদ্দেশ্যমূলক। এই উদ্দেশ্য কোনো অর্থনৈতিক লাভ বা অন্যান্য সুযোগ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হতে পারে।

দুর্নীতির ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নির্ধারিত কর্তব্যকর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে অবহেলা করে। এর উদ্দেশ্য হলো অন্যান্য সুযোগসুবিধা লাভ করা। আর্থিক লাভ, কোনো পদ লাভ, কারো সম্পত্তি অধিকার অথবা অন্য কোনো সুযোগসুবিধার জন্য যখন কোনো ব্যক্তি তার কর্তব্য সম্পাদনকে স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে তখন তা দুর্নীতি হিসেবে পরিগণিত হয়। ক্ষমতাবান ব্যক্তিরাই দুর্নীতিতে সামিল হতে পারে।

অনেক সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষজন নিজেদের কায়েমি স্বার্থ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করেন। শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেকসময় ব্যক্তিবর্গ আইন লঙ্ঘন করতে দ্বিধা বোধ করে না। তারা নিজেদের আইনের ঊর্ধ্বে বলে বিবেচনা করে। ভোটে সাফল্য অর্জনের পর সাংসদ বিধায়কদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুষ ও উপরি উপার্জনের লেনদেনে সামিল হয়ে পড়েন। সমাজ ও সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের কাছে একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি অধিকতর ক্ষতিকর। এরা সাধারণত উচ্চ মর্যাদাযুক্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষজন সরকারি বিধিব্যবস্থাকে নির্দ্বিধায় উপেক্ষা করে। উদাহরণ স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত নির্মাণকার্য না হওয়া সত্ত্বেও নির্মাণকর্মে ব্যয়জনিত অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের জন্য সন্তোষজনক প্রমাণপত্র দিয়ে টাকা দিয়ে দেওয়া হয়। অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট নির্মাণকর্ম ভেঙে পড়ে।

ভারত হলো অতি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। সাম্প্রতিক কালে এখানে দুর্নীতিমূলক কাজকর্ম লাগামছাড়া হয়ে পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতির কারণে ভারতীয়

রাজনীতির অবক্ষয় ঘটেছে ভারতে দুর্নীতির মূল অতি গভীরে প্রোথিত। অনিয়ন্ত্রিতভাবে ও অপ্রতিহত গতিতে দুর্নীতি ভারতের জনজীবনকে গ্রাস করে ফেলেছে। ভারতের রাজনীতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কালক্রমে তাদের একটি অংশ দুর্নীতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। আরেকটি অংশ কার্যত পরাজয় শিকার করে নিয়েছেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের লম্বা চওড়া কথা পর্বতের মূষিক প্রসবের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

SOCIOLOGY

2018

বিভাগ -খ (MCQ)

2) বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ **1×24=24**

(i) ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবক্তা হলেন-

a) রাজেন্দ্র সিংহ
b) জি. এস. ঘুরে
c) এডওয়ার্ড শীলস্
d) পার্থ মুখার্জী

উঃ (c) এডওয়ার্ড শীলস্

(ii) 'The Positive Background of Hindu Sociology' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন-

a) এ. আর. দেশাই
b) ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়
c) বিনয় কুমার সরকার
d) আন্দ্রে বেঁতে

উঃ (c) বিনয় কুমার সরকার

(iii) ভারতে প্রথম দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি সূচনা হয় কার হাত ধরে ?

a) গোপাল হালদার
b) ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
c) রনজিৎ গুহ
d) সুমিত সরকার

উঃ (a) গোপাল হালদার

(iv) ''আইন-ই আকবরী'' কে 'Mughal Gazetteer' বলেছেন কে ?

a) ইরাবতী কার্ভে
b) এস. সি. দুবে
c) বিনয় কুমার সরকার
d) এ. আর. দেশাই

উঃ (c) বিনয় কুমার সরকার

(v) নিম্নলিখিত কোন আইনটি স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভে সহযোগিতা করেছে ?

a) Hindu Marriage Act, 1955
b) Special Marriage Act, 1954
c) Hindu Succession Act, 1961
d) Dowry Prohibition Act, 1961

উঃ (a) Hindu Succession Act, 1961

(vi) কোনটি ভিন্ন তা উল্লেখ করোঃ

a) ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি- বিনয় কুমার সরকার

b) ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি—ম্যাক্স ওয়েবার

c) কার্য কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি এম. এন. শ্রীনিবাস

d) দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি—এডওয়ার্ড শীল্‌স্‌

উঃ (d) দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি—এডওয়ার্ড শীল্‌স্‌

(vii) ভারতে সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার বিকাশ শুরু হয় _____ সাল থেকে।

a) 1979 b) 1951

c) 1919 d) 1851

উঃ (d) 1851

(viii)_____এর মুখপত্র 'Sociological Bulletin' 1920 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়

a) Indian Sociological Society

b) Bethune Society

c) Bombay Anthropological Society

d) Indian Statistical Institute

উঃ (a) Indian Sociological Society

(ix) 'আধিপত্যকারী জাতি' ধারণাটি কার ?

a) ডি. পি. মুখার্জী b) বিনয় কুমার সরকার

c) এম. এন শ্রীনিবাস d) জি. এস. ঘুরে

উঃ (c) এম. এন শ্রীনিবাস

(x) 'The Indian Jajmani System' গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?

a) ইয়ান রবার্টসন b) রাম আহুজা

c) এম. এন. শ্রীনিবাস d) উইলিয়াম এইচ. ওয়াইজার

উঃ (d) উইলিয়াম এইচ. ওয়াইজার

(xi) এর মধ্যে কোন বিষয়টি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের বৈশিষ্ট্যবাহী ?

a) ব্যক্তিগত মালিকানা b) শিল্পায়ন

c) বাজারবিহীন অর্থনীতি d) মুদ্রা ব্যবস্থা

উঃ (c) বাজারবিহীন অর্থনীতি

(xii) কোনটি আধুনিকীকরণের বৈশিষ্ট্য নয় ?

a) নারী প্রগতি b) ধর্মনিরপেক্ষতা

c) আরোপিত মর্যাদা d) সামাজিক সচলতা

উঃ (d) আরোপিত মর্যাদা

(xiii) "ধর্ম ও মানবতা হলো অভিন্ন"-উক্তিটি কার ?

a) ফ্রেজার b) ম্যাকাইভার

c) ডুর্খাইম d) কোঁত

উঃ (d) কোঁত

(xiv) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয় কত সালে ?

a) 1835 b) 1840

c) 1857 d) 1861

উঃ (a) 1835

(xv) হিন্দু বিবাহ আইন কবে পাশ হয়?

a) 1940 b) 1950

c) 1955 d) 1960

উঃ (c) 1955

(xvi) বাবাসাহেব নামে কে পরিচিত ?

a) গোপাল কৃষ্ণ গোখলে b) ড. বি. আর. আম্বেদকর

c) ডি. এন. মজুমদার d) ডি. সি. ভট্টাচার্য

উঃ (b) ড. বি. আর. আম্বেদকর

(xvii) স্বামী বিবেকানন্দ কয়টি যোগের কথা বলেছিলেন ?

a) 2 b) 4 c) 8 d) 10

উঃ (b) 4

(xviii) কার উদ্যোগে 'নারী শিক্ষা ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হয় ?

a) রবীন্দ্রনাথ b) বিবেকানন্দ

c) গান্ধীজী d) বিদ্যাসাগর

উঃ (d) বিদ্যাসাগর

(xix) জন্মনিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে-

a) নারীশিক্ষার হার b) পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি

c) ধর্মীয় সংস্কার d) বাল্যবিবাহ

উঃ (b) পরিবার কল্যাণ কর্মসূচি

(xx) শান্তারাম কমিটি কোন্ সামাজিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত ?

a) পরিবেশ b) দারিদ্র্য

c) দুর্নীতি d) বেকারত্ব

উঃ (c) দুর্নীতি

(xxi) বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) প্রস্তাব কোন্ বিষয়ের পরিচায়ক ?

a) আঞ্চলিকতা b) সাম্প্রদায়িকতা

c) ধর্মনিরপেক্ষতা d) সন্ত্রাসবাদ

উঃ (b)সাম্প্রদায়িকতা

(xxii) 'শ্রমবিমুখতা' দারিদ্র্যের কী ধরনের কারণ ?

a) ব্যক্তিগত b) সামাজিক

c) ভৌগোলিক d) অর্থনৈতিক

উঃ (a) ব্যক্তিগত

(xxiii) 'আপ্পিকো আন্দোলন' কোন রাজ্যে ঘটেছিল ?

a) কেরালা b) কর্ণাটক

c) আসাম d) উড়িষ্যা

উঃ (b) কর্ণাটক

(xxiv) নিঃশব্দ উপত্যকা আন্দোলন জড়িত _____এর সাথে।

a) পরিবেশ b) সাম্প্রদায়িকতা

c) ভোটের অধিকার d) বনসৃজন

উঃ (a) পরিবেশ ।

3) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) ঃ 1×16=16

(i) ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির দুটি বৈশিষ্ট্য ঃ-

1) এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। তাই একে বলা হয় 'Culturological'.

2) ধ্রুপদী হিন্দুশাস্ত্র সমূহের অধ্যয়ন-অনুশীলনের মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়— যে কারণে এম. এন শ্রী নিবাস ভারততত্ত্বকে ''The Book View' বলেছেন।

অথবা

কোন দৃষ্টিভঙ্গিকে Culturological বলা হয়?

উঃ ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় তাই ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হয় Culturological.

(ii) কার উদ্যোগে কত সালে এশিয়াটিকে সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ স্যার উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অথবা

নৃকুল সমাজতত্ত্ব কী ?

উঃ নৃকুল সমাজতত্ত্ব হলো কোনো মানবগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা ও শাস্ত্রসমূহ থেকে অর্থ ও প্রতীক, সাংকেতিক ভাষা ও সংক্ষিপ্তসার অনুসন্ধান।

(iii) জাতি পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছিল কেন?

উঃ প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট আচার-আচরণ ঠিকমতো পালিত হচ্ছে কিনা বা তার বিচ্যুতি ঘটলে কী প্রকার শাস্তি প্রদত্ত হবে তা দেখাশোনার দায়িত্বে যে সংগঠনটি বর্তমান ছিল তাকে বলা হয় জাতি পঞ্চায়েত।

(iv) জাত ব্যবস্থার উপর লিখিত রাজা রামমোহন রায়ের দুটি প্রবন্ধের নাম লেখো।

উঃ রাজা রামমোহন রায়ের জাত ব্যবস্থার ওপর লিখিত দুটি প্রবন্ধ হলো-''ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" ও ''গোস্বামির সহিত বিচার"।

(v) উদারীকরণ বলতে কী বোঝায়?

উঃ সাধারণ অর্থে উদারীকরণ বলতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কোনো সামাজিক অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে পূর্ববর্তী সরকারের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা বা সীমাবদ্ধতা শিথিলতাকে বোঝায়। তবে উদারীকরণ বলতে মূলত অর্থনৈতিক উদারীকরণকে বোঝানো হয় যার দ্বারা বাণিজ্য ও বাজার মূলধন (Trade and market capital) এর উপর হোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস বা অবলুপ্তির বিষয়টি প্রকাশ পায়।

অথবা,

SAARC এর পূর্ণরূপ কী?

উঃ South Asian Association for Regional Co-operation.

(vi) প্রান্তীয় যৌথ পরিবার কাকে বলে?

উঃ মাত্র দুটি প্রজন্ম একত্রে থাকে এবং বসবাসের ক্ষেত্রে সম্পত্তি ও কার্যধারার যৌথতায় বিশ্বাসী এমন পরিবারকে বলা হয় প্রান্তীয় যৌথ পরিবার।

অথবা,

ধর্মের কয়টি দিক ও কী কী?

উঃ ধর্মের দুটি দিক-

1. অন্তরঙ্গ দিক

2. বহিরঙ্গ দিক

(vii) শ্রীঅরবিন্দর মতে ত্রিবিধ রূপান্তর কী কী ?

উঃ ঋষি অরবিন্দর মতে ত্রিবিধ রূপান্তর হলো-

1 . আত্মগত রূপান্তর (Psychic Transformation)

2. আধ্যাত্মিক রূপান্তর (Spiritual Transformation)

3. অতিমানসিক রূপান্তর (Supramental Transformation)

অথবা,

ঋষি অরবিন্দের দুটি গ্রন্থের নাম লেখো

উঃ 1. 'The Life Divine'

2. 'The Renaissance in India'

(viii) বিদ্যাসাগর কত সালে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ?

উঃ বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন।

(ix) পরিবারের দুটি প্রধান কাজ উল্লেখ করো

উঃ পরিবারের দুটি প্রধান কাজ হলো–

i) যৌন আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি

ii) সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালন

অথবা

ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তনে পরিবারসমূহ কোন্ একক থেকে কোন্ এককে পরিবর্তিত হয়েছে?

উঃ পরিবারগুলি উৎপাদনশীল একক (Production Unit) থেকে ভোগ একক (Consumtion Unit) এ পরিণত হয়েছে।

(x) গ্রীন হাউস এফেক্টের জন্য কী ধরনের সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ?

উঃ গ্রীন হাউস এফেক্টের ফলে বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্য পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অথবা

BPL কথাটির পূর্ণ রূপ কী?

উঃ Below Poverty Line হলো BPL-এর পূর্ণরূপ।

(xi) আধুনিকীকরণের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক এক কথায় বলো ঃ

উঃ আধুনিকীকরণ ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষা আধুনিকীকরণের পথকে প্রশস্ত করে।

(xii) কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে কী বোঝায়?

উঃ কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ বলতে বোঝায় পুরনো কৃষি উৎপাদন পদ্ধতিকে বাতিল করে উৎপাদনকে বাজারমুখী করার চেষ্টা, অতিরিক্ত উৎপাদন, পণ্যকে বাণিজ্যের উপাদান

হিসেবে দেখা, চাহিদাভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, বিনিময় প্রথার পরিবর্তে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা এই সবকিছুই কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ।

অথবা,

জনবিদ্যা কাকে বলে?

উঃ জনসংখ্যা বিষয়ক আলোচনাকে জনবিদ্যা বলা হয়। এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হলো- জনসমষ্টির আয়তন, কাঠামো, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি।

(xiii) আপেক্ষিক দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ?

উঃ আপেক্ষিক দারিদ্র্যের ধারণা অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি তার সমাজে অন্যান্যদের তুলনায় দরিদ্র অর্থাৎ অন্যান্যদের জীবনযাত্রার তুলনায় তার জীবনযাত্রার মান নিম্নে অবস্থিত অর্থাৎ এই বিষয়টি দারিদ্র্যের সামাজিক ধারণা প্রশ্রয় দেয়।

অথবা,

পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের দুটি ব্যবস্থা উল্লেখ করো।

উঃ পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের দুটি উপায় বা ব্যবস্থা হলো-

(i) পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাদান ও সচেতনতা গড়ে তোলা।

(ii) পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক যে সকল আইন, নিয়মবিধি ও প্রজ্ঞাপন রয়েছে সেগুলির যথার্থ প্রয়োগ কার্যকর করে তোলা।

(xiv) নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত দুটি কর্মসূচীর নাম লেখো।

উঃ 1. NAEP-(National Adult Education Programme)

2. NLM-(National Literacy Mission)

(xv) ICDS. এর পূর্ণরূপ কী?

উঃ **Integrated Child Development Services**

(xvi) এখনো পর্যন্ত ভারতের বৃহত্তম শিক্ষার কর্মসূচী কোনটি?

উঃ ভারতের বৃহত্তম শিক্ষার কর্মসূচী – সর্বশিক্ষা অভিযান। এটি ২০০১ সালে প্রবর্তিত হয়।

SOCIOLOGY

2019

বিভাগ -ক (40 Marks)

1) নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) 8 × 5=40

(a) ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কি বোঝায়? এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিকগণের ভূমিকা আলোচনা করো। 3+5

উঃ ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হল ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস সাহিত্য প্রভৃতির বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ভারত তথা ভারতীয় উপমহাদেশ সংলগ্ন দেশগুলির সমাজব্যবস্থা ও তার উপাদানগুলি সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী প্রতিটি সমাজের কিছু না কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যাদি বর্তমান। সেই মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির যথাযথ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ওই সমাজের সামগ্রিক চিত্রটি ফুটে ওঠে। আর এইখানেই ভারতীয় সমাজ অধ্যয়নে ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য।

ভারতে বহু ভাষাভাষী লোকের বাস। বিভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র হল ভারতবর্ষ। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ভাষা ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যুগ যুগ ধরে। এইভাবেই সামাজিক একাত্মবোধ গড়ে উঠেছে। বিভেদের মধ্যে মিলন সূত্র হয়ে উঠেছে এই ভারতবর্ষ।

- যে সকল ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিগণ এই দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁরা হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে প্রমুখ। তাঁদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভারতবর্ষের ইতিহাস একদেশদর্শী নয়, বলা যায় ব্রহ্মচেতনার শামিল। ভারতীয় জনগণের জীবনচেতনা কোনোদিন ভৌগোলিক ও বস্তুচেতনার উপেক্ষা না করে সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছিল অনন্য প্রজ্ঞামানসিকতায়, তার সংস্কৃতি চেতনায় ছিল বিশ্বজনীনতা। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল চিন্তাধারা হল- 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য'-র স্থাপন। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ আয়ত্ত করেছে একটি মিশ্র সংস্কৃতি বা Composite Culture-কে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল বহুত্ব।

ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি গুরুত্বপূর্ণ উজ্জ্বল বিষয় হল তা সংস্কৃতিনিষ্ঠ ভারতীয় সমাজ, জগৎ সংস্কারকে এক অখণ্ড সমগ্র হিসাবে ধরে জগৎ সংসারের ঘটনা বিষয়কে অনিবার্যভাবেই পরস্পর নির্ভরশীল বলে গণ্য করে আসছে। এর মূলকথা এই যে, ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টিগত সমাজ যে সকল ধ্যানধারণা ও আচরণগত রীতিনীতি অনুসরণ করে জীবন নির্বাহ করবে তাতে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক এই উভয় দিকই উপস্থিত থাকবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গির আরও একটি বিশেষ দিক হল-সামাজিক গতিশীলতা বিষয়টি অনুধাবন ও তার দিকনির্দেশ। ভারতের একদল সমাজতাত্ত্বিক তাঁদের রচনায় ভারতের সমাজ পরিবর্তন, উন্নয়ন ও প্রগতি সম্পর্কে দিকনির্দেশ দিয়েছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আধুনিকতার অনুসরণে সমাজ কাঠামোয় যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেটির বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও ভারতীয় সমাজে বর্ণাশ্রম প্রথার একমুখী দিক ও এই প্রথার প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি– এই দুটিই এক্ষেত্রে আলোচ্য হয়ে ওঠে। এবিষয়ে এম. এন শ্রীনিবাস, এ. আর. দেশাই, যোগিন্দর সিং-এর নাম উল্লেখ্য।

ভারততাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণের যে মূল সূত্রগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হল-ভারতের ঐতিহ্যে মানবিক ধর্মই ছিল মূল সুর। আধ্যাত্ম দর্শন নির্ভর ভারতবর্ষ বস্তুকে উপেক্ষা না করে আধ্যাত্মিকতা, মানবতা, ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাদর্শকে সমাজের মধ্যে স্থাপন করেছিল।

অথবা

(a) ভারতবর্ষে প্রাক-স্বাধীনতা যুগে সমাজতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করো। এই প্রসঙ্গে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান লেখো। 5+3

উঃ ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন বেদ-উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, মহাবীর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রমুখ মহাপুরুষদের উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি উপেক্ষা করা যায় না ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক, কবি, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন মনীষীদের। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশব চন্দ্র সেন, বিবেকানন্দ, সৈয়দ আহমেদ খান। এই সমস্ত সমাজ সংস্কারকগণ ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, আন্তঃমানবিক সম্পর্কের দিক নির্দেশ, ইতিকর্তব্য নির্ধারণের মধ্যে দিয়ে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনার বিকাশে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে এই সমস্ত সামাজিক চিন্তাবিদ, দার্শনিক, প্রশাসক ভারতীয় সমাজকে বোঝার জন্য কাজ করেছিলেন ও এর পাশাপাশি আইন, পরিবার, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদির মতো ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন দিক অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আলোচনাটিকে একটি শৃঙ্খলা হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তাঁরাই ভারততাত্ত্বিক হিসাবে সমাজতত্ত্বের উদ্ভবে বিশেষ অবদান রেখে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত ভারততাত্ত্বিকরা তাঁদের জ্ঞানচর্চা, আন্তঃজাগতিক সহিষ্ণুতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কবাদ সম্পর্কে ধারণা দেন। তাঁদের মতানুযায়ী মানবজাতির মধ্যে পরস্পর সম্পর্কিত নানা সংস্কৃতি বিদ্যমান, যা বোঝার জন্য সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।

ভারতে সমাজতত্ত্বের বিকাশে দৃষ্টবাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের নাম বিশেষ করে উল্লেখ্য। তিনি কোঁতের দৃষ্টবাদের অন্যতম

অনুসরণকারী। এই সময় পাশ্চাত্য সমাজের চিন্তাভাবনা এবং ভারতীয় সামাজ ভাবনা– এই দুটির মধ্যে উভয়দেশের চিন্তাবিদদের তুলনামূলক আলোচনা চলতে থাকে। এছাড়াও বেথুন সোসাইটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে এবং ভারতীয় ও ইউরোপিয়নদের মধ্যে সমঝোতা ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করেছিলেন যা সমাজতত্ত্বের বিকাশে সাহায্য করেছিল অনেকাংশে। এইরকমই বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা ভারতে সমাজতত্ত্বের বিকাশে অবদান রেখেছিল। এই সভা-তে একাধিক বিদগ্ধজন তাঁদের সমাজ সম্পর্কিত নিবন্ধ বিভিন্ন সময় পাঠ করেছিলেন। এই সমস্ত শিক্ষাবিদরা ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্য রক্ষায় ও এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

- ভারতবর্ষে বিষয় হিসাবে সমাজতত্ত্বের পঠনপাঠন প্রথম শুরু হয় ১৯১৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্যাট্রিক গেডেজ ছিলেন প্রথম অধ্যাপক সমাজতত্ত্ব ও পৌরবিদ্যা বিভাগের। স্বতন্ত্র সমাজতত্ত্ব বিভাগটি চালু হয় এর কিছু বছর পরে, ১৯৩০ সালে। গোবিন্দ সদাশিব ঘুরে ছিলেন সমাজতত্ত্ব বিভাগের, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যাপক। ঘুরে শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে সমাজতাত্ত্বিক চর্চাকে আলাদা রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে ৫৫ জন ছাত্র-ছাত্রী গবেষক ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর সমসাময়িক চিন্তাবিদ ছিলেন এস. ডি. কেটকার, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যারা সমাজতত্ত্বকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন। ঘুরের চেষ্টায় Indian Sociological Society-র মুখপত্র Sociolgical Bulletin 1920 সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাঁর দীর্ঘ অধ্যাপনা জীবনে বহু ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তীকালে সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁরা হলেন ইরাবতী কার্ভে, এ. আর. দেশাই, ডি. নারাইন প্রমুখ। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিষয়টিকে সুনামের সাথে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

(b) ভারতের যজমানি ব্যবস্থা কাকে বলে? ভারতে যজমানি ব্যবস্থার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ আলোচনা করো। 3+5

উঃ গ্রামীণ সমাজের একটি সুপ্রাচীন সর্বভারতীয় প্রথা হল যজমানি ব্যবস্থা। যজমানি কথাটি বৈদিক শব্দ, যা সংকীর্ণ অর্থে পৌরোহিত্য বোঝালেও ব্যাপক অর্থে পৃষ্ঠপোষকতাকে বোঝানো হয়। মূলত বিভিন্ন জাতের অন্তর্ভুক্ত পরিবারগুলির মধ্যে পেশাভিত্তিক সেবা ও উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময় কে কেন্দ্র করে দাতা-গ্রহীতার পারস্পরিক বংশপরম্পরাগত ব্যবস্থাই হল যজমানি প্রথা। সেবা গ্রহণকারী যজমান ও সেবাপ্রদানকারী কামিনের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রার পরিবর্তে দ্রব্যের ব্যবহারই মুখ্য ছিল। বিভিন্ন স্থানে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের ভিন্নতা অনুযায়ী এর ভিন্নরূপতা থাকলেও, অর্থনৈতিক বিনিময়ের মৌলিক সূত্রটি সর্বত্র অভিন্ন ছিল। এটি ছিল অবিধিবদ্ধ, অপ্রাতিষ্ঠানিক অলিখিত নিয়মাধীন। সর্বভারতীয় নিয়ম ও প্রশাসনিক কাঠামো এর মধ্যে ছিলনা।

উইলিয়াম এইচ. ওয়াইজার-এর ''The Indian Jajmani System'' গ্রন্থে প্রথম 'যজমানি প্রথা' সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। ডেভিড ম্যান্ডেলবাম্ যজমানি প্রথাকে ধারাবাহিকতা সম্পন্ন প্রথা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

- **যজমানি প্রথার ইতিবাচক দিক ঃ**

(১) যজমানি প্রথা সমাজে ঐক্য ধরে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই প্রথায় দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছড়িয়ে পড়েছিল আত্মমানবিক সম্পর্কে।

(২) যজমানি প্রথার জন্যই তৎকালীন সমাজে বিনিময়কে ঘিরে বড়ো কোনো জটিলতা দেখা যায়নি। এই প্রথায় দ্রব্য বা সেবার মূল্যমান নির্ধারণে নিরপেক্ষতা থাকত। এছাড়াও, এর মাধ্যমেই উৎপাদন, চাহিদা, ও বণ্টনের সামঞ্জস্য বিধানের বিষয়টি সুরক্ষিত ছিল।

(৩) যজমান ও কামিনদের আদানপ্রদান বংশপরম্পরায় চালিত হত, তাই উভয়েরই কাছে তা ছিল অর্থনৈতিক নিশ্চিত নিরাপত্তার বিষয়। এক জাতিগোষ্ঠী অন্য জাতিগোষ্ঠীকে, এক পরিবার অন্য পরিবারকে পর্যাপ্ত পরিসেবা দিতে দায়বদ্ধ থাকত। যজমানদের যেমন দ্রব্যের জন্য চিন্তা ছিল না, কামিনদেরও নতুন করে পেশা খুঁজতে হত না।

- **যজমানি প্রথার নেতিবাচক দিক ঃ**

(১) যজমানি প্রথায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের রূপটি প্রকাশিত হত। এই সম্পর্ককে ঘিরে গ্রামসমাজে উর্ধ্বঃতন-অধস্তন সম্পর্ক দেখা যেত। যজমানদের শুদ্ধ জাত ও কামিনদের অশুদ্ধজাত হিসাবে মনে করা হত। এইভাবে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদটি প্রকট হত।

(২) যজমানি প্রথায় কামিনদের ক্ষেত্রে পেশাগত সচলতার পথ বন্ধ ছিল। যেহেতু পেশা বংশপরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা সম্পূর্ণ জাতভিত্তিক, ফলে কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সামর্থ থাকলেও চিরাচরিত এই ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারত না। ফলে তার সামাজিক সচলতার পরিধিও সংকীর্ণ ছিল।

(৩) যজমানি প্রথা ভারতীয় অর্থনীতির সংকীর্ণ রূপকে প্রকাশ করে। এর ফলেই ভারতীয় গ্রামসমাজে অন্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু হয়নি। ফলে এই সময় বহির্বাণিজ্য, বাজার অর্থনীতি, বাজার পণ্য প্রভৃতির অভাবে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে ছিল।

(c) ধর্ম সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো **8**

উঃ পর্ষদের 2016 সালের 1 (e) -এর উত্তর দেখো।

অথবা

(c) ধর্ম সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করো। 8

উঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন একাধারে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক, দার্শনিক, কবি ও শিক্ষা সংস্কারক। চিরন্তন অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী আজাদ আমৃত্যু হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তিনি বলেছিলেন জাতি ও সভ্যতাকে গর্ব ও অহংকারের মিথ্যা অনুভূতি যখন বারবার ধ্বংস করেছে সেই সময় মহান ব্যক্তিরা কোথা হতে উদ্ভূত হয়ে সংকীর্ণ সংঙ্গায়িত বিশ্বদর্শনের প্রতিবাদ জানিয়ে ধর্মীয় ধর্মান্ধতা ভেঙে ফেলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

রক্ষণশীল পরিবারে ১৮৮৮ সালের ১১ নভেম্বর আবুল কালামের জন্ম হয়। তাঁর জন্মস্থান ছিল মক্কা। মাত্র ১১ বছর বয়সেই তিনি আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি রপ্ত করেন। আর ১৬ বছর বয়সে, ইসলামের এক বার্ষিক সভায় তাঁর বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে এবং ইসলামী দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য আলেম সমাজ তাঁকে 'মৌলানা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি স্যর সৈয়দ আহমদ খানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। আহমেদের লেখা পড়ে আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহী হন। পারিবারিক কক্ষপথ ছেড়ে তিনি সত্যের সন্ধানে নিজস্ব পথে বেড়িয়ে পড়েন। তিনি বলতেন ধর্ম যদি সর্বজনীন সত্য প্রকাশ করে থাকে, তাহলে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ রাখা অনুচিত, তেমনি প্রত্যেক ধর্মের স্বীয় মতকে সত্যের একমাত্র আধার বলে বিবেচনা করাও উচিত নয়। তাই তিনি যুক্তি ও দৈবশক্তিতে আস্থা এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তাঁর "India Wins Freedom" গ্রন্থে 'আজাদ' ছদ্মনাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন, যার দ্বারা তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধহীনতার কথা বলেছিলেন।

আবুল কালাম ১৯১২ সালের ১৩ জুলাই 'আল হিলাল' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা অদ্ভুত সাড়া পেয়েছিল সেই সময়। এখানে তিনি ইংরেজদের প্রতি মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য ও মুসলমানদের প্রতি ইংরেজদের বিরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। এছাড়াও তিনি একাধিক আন্দোলনের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন যার মধ্যে খিলাফত আন্দোলন অন্যতম। এই খিলাফত আন্দোলন সূচনাকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কান্ডারী ছিলেন তিনি, যা আবার ভারতীয় মুসলিম আন্দোলন নামেও পরিচিত। মূলত ইসলামী খেলাফত পুনরুদ্ধার করতে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রবক্তা ছিলেন আবুল কালাম। তিনি বিশ্বাস করতেন সব ধর্মই তার নিজস্ব মত ও পথে চলতে পারে, কিন্তু সকল ধর্মের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তিনি বুঝেছিলেন সাম্প্রদায়িক ঐক্য বজায় থাকলে উপমহাদেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে এবং

বিশ্বের মানচিত্রে ভারতবর্ষ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে সম্মানের সঙ্গে অবস্থান করবে। যেখানে হিন্দু-মুসলিম জাতি বিদ্বেষ থাকবে না এবং উপমহাদেশের জনগণ ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের উর্ধ্বে প্রজাতন্ত্রের জন্য কাজ করতে পারবে। তিনি বলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তাদের মধ্যে চিরকাল অশান্তি বজায় থাকবে। উভয় দেশের বার্ষিক বাজেটে উন্নয়ন বরাদ্দ কমে গিয়ে সামরিক বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে আদতে এবং ক্ষতি হবে সাধারণ জনগণের। তাঁর সেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যুক্তি আজও বর্তমানে ভারতে রূঢ় বাস্তব।

(d) পরিবারের সংজ্ঞা দাও। ভারতবর্ষে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভাঙনের কারণগুলি লেখো **3+5**

উঃ পরিবার হল বিবাহ, রক্তের সম্পর্ক বা দত্তক সূত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠী যারা অভিন্ন বাসগৃহে বসবাস করে; যারা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, ভাই-বোনের যথাযোগ্য সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী পরস্পরের সাথে আন্তঃক্রিয়া ও সংযোগ সম্পর্কে শামিল হয়ে এক অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

পরিবার একটি বিশ্বজনীন সংস্থা। এটি সমাজের অন্যতম একটি প্রাথমিক গোষ্ঠী। সামাজিক সংগঠন হিসাবেও পরিবার হল একটি অপরিহার্য সংগঠন। মানুষ তার সামাজিক চাহিদাগুলি অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মিটিয়ে নিতে পারলেও মূলত জৈবিক চাহিদাগুলি পরিবারের দ্বারাই পূরণ হয়। পরিবার আবেগপূর্ণ ভিত্তির ওপর দাড়িয়ে থাকে। পরিবারের একটি নির্দিষ্ট আকার হয়। পরিবার ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবার বিভিন্ন ধরনের হয়। পরিবারের মধ্যে দিয়েই বংশানুক্রম রক্ষিত হয়। সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম হল পরিবার।

- যৌথ পরিবার হল ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি একক পরিবারের সমষ্টিকে আমরা যৌথ পরিবারে বলতে পারি। যৌথ পরিবারে সাধারণত দুই-এর বেশি প্রজন্ম একই আবাসগৃহে বসবাস করে। বর্তমান ভারতবর্ষে পরিবার ব্যবস্থায় এই যৌথ রূপ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। নিম্নে এই পরিবারের ভাঙনের কতগুলি কারণ নিয়ে আলোচনা করা হল ঃ

(১) আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ঃ

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম বিষয় হল বিধিবদ্ধ শিক্ষাসূচি ও উপার্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা গ্রহণ। এই দুটি বিষয় ব্যক্তিবর্গের মনোভাব, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, আদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যার ফলস্বরূপ আত্মকেন্দ্রিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা, পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতা, স্বাধীন চিন্তাভাবনা অনুযায়ী দিনযাপন, মহিলাদের আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এই বিষয়গুলি যৌথ পরিবার ব্যবস্থাকে ভেঙে একক পরিবার গড়ে তুলতে ইন্ধন দিচ্ছে।

(২) শিল্পায়ন ঃ

বর্তমানে যন্ত্রপাতিনির্ভর কলকারখানাভিত্তিক শিল্পব্যবস্থা মানুষের চিন্তাভাবনা ও কাজকর্মকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। যার ফলে ব্যক্তি বাধ্য হয়েই শিল্পাঞ্চলে তার নতুন বাসস্থান গড়ে তুলেছে। পরিবার Production Unit থেকে Consumption Unit-এ পরিবর্তিত হয়েছে। এছাড়াও শিল্পায়ন পরিবারের অল্পবয়স্ক সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছে, যা তাদের যৌথ পরিবারের বয়ঃজেষ্ঠ্যদের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

(৩) নগরায়ন ঃ

নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ যৌথ পরিবারগুলিকে ভেঙে ফেলতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। ব্যক্তি মাত্রই সুখ-স্বাচ্ছন্দ ও স্বাধীনতাপ্রিয়-যা নগর জীবনের দ্বারা পূরণ সম্ভব। একদিকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, অন্যদিকে এই জাতীয় ইচ্ছা ব্যক্তিকে নগরমুখী করে তুলেছে।

(৪) বিবাহ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঃ

যৌথ পরিবারগুলিতে আয়োজিত বিবাহের প্রাধান্য দেখা যায় কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের কাছে রোমান্টিক বিবাহের কদর বেশি। এক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজের একটি আইনের কথা উল্লেখ্য Special Marriage Act, 1954 যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে পিতা-মাতার মতামত ছাড়াই পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, বিবাহের স্বাধীনতা ও অধিকারের কথা বলা আছে। এর ফলে যৌথ পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে সংসার করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একক পরিবার গঠনে সাহায্য করেছে।

(৫) পাশ্চাত্যের প্রভাব ঃ

পাশ্চাত্যকরণ ভারতীয় যৌথ পরিবারের ভাঙনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যেমন-আধুনিকতা, ভোগবাগ, যুক্তিবাদ, সাম্য, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতা, স্বাধীন জীবনযাত্রা, নারী স্বীধীনতা, Live Together প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

(e) শিক্ষা বলতে কী বোঝ? মহাত্মা গান্ধির শিক্ষাচিন্তা বিষয়ে আলোচনা করো। 3+5

উঃ শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জন করা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। বাংলায় শিক্ষা শব্দটি এসেছে সংস্কৃত শাস্ ধাতু থেকে যার অর্থ হল শাসন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, শৃঙ্খলাবদ্ধ করা। বিভিন্ন চিন্তাবিদ শিক্ষাকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

- ডুরখেইমের মতে, শিক্ষা হল নব প্রজন্মের সামাজিকীকরণ।
- প্লেটোর মতে, শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও শক্তির বিকাশসাধন।

- স্বামীজির মতে, মানুষের মনে যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তার প্রকাশই হল শিক্ষা।
- রবীন্দ্রনাথের মতে, সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল তা, যা কেবল আমাদের তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্বসত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবন গড়ে দেয়।

  অর্থাৎ শিক্ষা বলতে বোঝায় প্রতিটি মানুষের মধ্যে জন্ম থেকে যে সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো রয়েছে, তার বিকাশসাধনে সাহায্য করা।

- **গান্ধিজির শিক্ষাচিন্তা ঃ** জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ভারতবাসীর জীবনে পরিপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যে তাঁর সমগ্র জীবন ধরে কাজ করে গেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা হল ব্যক্তির অন্তর্নিহিত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল রকম সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ। শিক্ষার কাজ হল আদর্শ নাগরিক তৈরি করা। তাই তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর তথ্য ও সংখ্যা মনে রাখার থেকে চরিত্র বিকাশের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

(ক) গান্ধিজির মতে শিক্ষার লক্ষ্য শুধুমাত্র জাগতিক সম্পদ বৃদ্ধি নয়, ব্যক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, তার বিকাশসাধন।

(খ) আত্ম-উপলব্ধি বা Self Realisation-কে তিনি সমস্ত শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করেছেন।

(গ) তিনি স্বাবলম্বিতা অর্জন ও কুষ্টিগত শিক্ষার উপরও জোর দিয়েছেন।

(ঘ) তাঁর চিন্তায় শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের সমন্বয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিক্ষার পাঠক্রম ঃ

তিনি বলেছিলেন পাঠক্রমের বিষয়গুলি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন সেগুলির সাথে সমাজজীবনের সম্পর্ক থাকে। তাই তিনি মূলত হস্তশিল্প, মাতৃভাষা, গণিত, সমাজবিদ্যা, সাধারণজ্ঞান, ছবি আঁকা, সংগীত, বাধ্যতামূলক শরীরচর্চার মতো বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছিলেন।

শৃঙ্খলা ঃ

তিনি শিক্ষার্থীর আত্ম-সংযম ও শৃঙ্খলার উপর জোর দেন। তাঁর মতে, আবেগ, কল্পনা, ইচ্ছাকে যদি যথাযথভাবে সংযত না করা যায়, তবে কোনো গঠনমূলক কাজ করা সম্ভব নয়।

গান্ধিজির শিক্ষাদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বুনিয়াদি শিক্ষা। এই শিক্ষা হল জাতির বুনিয়াদ বা ভিত্তি গড়ে তোলার উপযোগী। এই শিক্ষা পরিকল্পনার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকার

Tolstay Farm নামে। যা তিনি তাঁর সবরমতী ও সেবাগ্রাম আশ্রমে প্রয়োগ করেন। ১৯৩৫ সাল থেকেই গান্ধিজি তাঁর হরিজন পত্রিকায় বুনিয়াদি শিক্ষা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে লিখতে থাকেন। পরবর্তীকালে ওয়ার্ধার একটি সম্মেলনে ড. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে একটি কমিটিতে এই পরিকল্পনা জাতীয় শিক্ষানীতি হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় বলে একে 'ওয়ার্ধা পরিকল্পনা' বলা হয়। এটি 'নঈ তালিম' হিসাবেও পরিচিত।

এই বুনিয়াদি শিক্ষা পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি হল-

(ক) মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার বাহন।

(খ) মাধ্যমিক শিক্ষার পর্যায় হবে ৬-১৪ বছর।

(গ) বুনিয়াদি শিক্ষা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক।

(ঘ) কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার নীতি প্রতিষ্ঠিত হবে।

(ঙ) এই শিক্ষা আত্ম-নির্ভরশীল ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করবে।

(চ) সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্মে উৎসাহ প্রদান করতে বিদ্যালয়ে তার আয়োজন করতে হবে।

(ছ) সামগ্রিক চারিত্রিক বিকাশসাধন- স্বনির্ভরতা, জ্ঞান, অভ্যাস, কর্মদক্ষতা, সার্থক জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সমন্বয়সাধন করতে হবে।

গান্ধিজির এই শিক্ষাভাবনা আজও প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা এখন বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পঠনপাঠন প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তনের চিন্তা এসেছে। অন্ধ প্রতিযোগিতা, অসহিষ্ণুতা এইসব সামাজিক ব্যাধি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষিতে গান্ধিজির শিক্ষাচিন্তা নতুন দিশা দেখতে পারে।

অথবা

(e) গণমাধ্যম বলতে কী বোঝ? সমাজজীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করো। 3+5

উঃ সমাজ গঠনে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা অপরিসীম। গণতন্ত্রের বাস্তবায়নে গণমাধ্যম হল চতুর্থ স্তম্ভ। গণমাধ্যম বলতে পত্র-পত্রিকা, রেডিয়ো, টিভি, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সবকিছুকেই একত্রিত করে বোঝায়। এগুলির মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশের কাছে অতি অল্প সময়ে যোগাযোগ করা যায়। অর্থাৎ বলা যায় গণমাধ্যম হচ্ছে সংগৃহীত সকল ধরনের তথ্যের মাধ্যম, যা প্রযুক্তিগতভাবে গণযোগাযোগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বর্তমান সময়ে মোবাইল, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হিসাবে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এই মাধ্যমগুলির সাহায্যে অনেক প্রকার সেবা-বিশেষ করে ই. মেইল, ওয়েব সাইট, ব্লগিং, ইন্টারনেট এবং টেলিফোনের প্রচারকার্য পরিচালনা করা হয়। গণমাধ্যম জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটায়। সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের প্রহরী বলা হয়।

- **সমাজজীবনে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা কর হলঃ**

(১) গণতন্ত্রের সংরক্ষণ ও বিকাশ ঃ

সত্যিকারের গণতন্ত্র মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে ও মানুষকে ক্ষমতা দেয়। গণমাধ্যম তা সৃষ্টি করে যোগাযোগ আর স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে। এর মাধ্যমে সরকারের ঘোষিত বিভিন্ন পরিকল্পনা কর্মসূচির বিষয়ে জনগণকে সচেতন রাখে। কোনো বিষয়ের উপর জনমত সৃষ্টি করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এছাড়াও মানুষ যেন বৈষম্যের শিকার না হয় সেই দিকে বিশেষ নজর রাখে।

(২) সামাজিকীকরণে ভূমিকা ঃ

সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও, ইন্টারনেটে প্রকাশিত কোনো খবর বা অনুষ্ঠান ব্যক্তির চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে, বিজ্ঞান মনস্কতা বৃদ্ধি করে, নান্দনিকতার বিকাশ ঘটায়। গণমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন অসামাজিক ঘটনার শাস্তিমূলক দিক, নতুন আইন, সরকার কর্তৃক বিভিন্ন নির্দেশাবলি জানা যায়। ফলত তা আমাদের ইতিকর্তব্য স্থির করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। এজাতীয় অনুষ্ঠানগুলি এবং সংবাদ আমাদের মানসিকতা ও আচার-আচরণকে সাধ্যমতো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে থাকে।

(৩) গণমাধ্যমগুলির পক্ষপাতদুষ্টতা ঃ

বর্তমানে সংবাদপত্র এবং নিউজ চ্যানেলের সংখ্যা অধিকমাত্রায় হওয়ায় মানুষ গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্বের দিকটা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় অর্থ বা রাজনৈতিক দলের কাছে গণমাধ্যমের সমর্পন। এই বিষয়গুলির ফলে মানুষ অনেক সময় সংবাদ পড়া ও দেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে যা জনগণের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

(৪) গণমাধ্যামের মধ্যে প্রতিযোগিতা ঃ

বর্তমানে কোনো সংবাদ পরিবেশনকে ঘিরে একাধিক চ্যানেলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে অনেক সময় সত্যকে বিকৃত করা হয়, অতিরঞ্জিত করা হয়। ফলে জনগণের কাছে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য উপস্থাপিত হয়। এগুলো সমাজের ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এই জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি, ব্যাবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গণমাধ্যমগুলির অনুষ্ঠানকে এমনই অন্তঃসারশূণ্য করে তুলেছে যার থেকে শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি নেই বললেই চলে।

গণমাধ্যমের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বর্তমান সমাজজীবনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য– এই বিষয়ে কারও কোনো সন্দেহ নেই। তবে গণমাধ্যমগুলিকেও এই বিশ্বাস বজায় রাখার ক্ষেত্রে সর্বদা দায়িত্বশীল থাকার ভূমিকার কথা ভুললে চলবে না।

SOCIOLOGY

2019

বিভাগ -খ (40 Marks)

2. প্রতিটি প্রশ্নের বিকল্প উত্তরগুলির মধ্যে থেকে সঠিক উত্তরটি লেখো ঃ 1×24=24

(i) 'Village Communities in the East and West' গ্রন্থটি কার লেখা?

(a) উইলিয়াম জোন্‌স (b) আনন্দকুমার স্বামী

(c) হেনরি মেইন (d) বি.কে. সরকার

উঃ (c) হেনরি মেইন

(ii) সামাজিক সমস্যা _____ নিয়ে ভোরা কমিটি গঠিত হয়েছিল।

(a) দারিদ্র (b) নিরক্ষরতা

(c) বেকারত্ব (d) জনসংখ্যা স্ফীতি

উঃ (d) জনসংখ্যা স্ফীতি

(iii) কোনটি ভিন্ন তা উল্লেখ করো।

(a) প্যাট্রিক গেডেজ– মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়

(b) ড. বেলা দত্তগুপ্ত– কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

(c) ডি.এন. মজুমদার– লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

(d) বিনয় কুমার সরকার– পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

উঃ (d) বিনয় কুমার সরকার– পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

(iv) অরোভিল, একটি বিশ্ব সর্বধর্মসমন্বয় কেন্দ্র গঠিত হয়েছে _____ -এর শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

(a) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (b) শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ

(c) ঋষি অরবিন্দ (d) স্বামী বিবেকানন্দ

উঃ (c) ঋষি অরবিন্দ

(v) ভূমিদাস বলতে বোঝায়–

(a) কৃষক (b) প্রজাস্বত্বভোগী (c) ভূস্বামী (d) পরাধীন ভূমিহীন ব্যক্তি

উঃ (d) পরাধীন ভূমিহীন ব্যক্তি

(vi) উদারনীতিকরণ কত সালে ভারতবর্ষে গ্রহণ করা হয়েছে?

(a) 1890 সালে (b) 1990 সালে

(c) 1991 সালে (d) 1993 সালে

উঃ (c) 1991 সালে

(vii) 'পাশ্চাত্যকরণ' ধারণাটি প্রবর্তন করেন–

(a) জি.এস. ঘুরে (b) এম.এন. শ্রীনিবাস

(c) যোগেন্দ্র সিংহ (d) বিনয় কুমার সরকার

উঃ (b) এম.এন. শ্রীনিবাস

(viii) আরোপিত মর্যাদা হল–

(a) জাতি (b) শ্রেণি

(c) দাস প্রথা (d) এদের কোনোটিই নয়

উঃ (a) জাতি

(ix) কত সালে Hindu Widow's Remarriage Act প্রবর্তিত হয়?

(a) 1856 সালে (b) 1929 সালে

(c) 1950 সালে (d) 1955 সালে

উঃ (a) 1856 সালে

(x) ব্যাংক রাষ্ট্রীয়করণ হয় _____ সালে।

(a) 1959 সালে (b) 1950 সালে

(c) 1969 সালে (d) 1979 সালে

উঃ (c) 1969 সালে

(xi) নারীশিক্ষা এবং জনশিক্ষা _____ এর শিক্ষা পরিকল্পনার অন্যতম দুটি উদ্দেশ্য ছিল।

(a) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (b) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(c) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (d) জি. কে. গোখলে

উঃ (a) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

(xii) আধুনিক ভারতীয় সমাজে দুর্নীতি একটি–

(a) শর্ত (b) প্রক্রিয়া (c) সামাজিক ব্যাধি (d) পরিমাপ

উঃ (c) সামাজিক ব্যাধি

(xiii) ভারতবর্ষে সমাজতত্ত্বের প্রাতিষ্ঠানিক আরম্ভ হয়েছিল কলকাতাতে _____ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

(a) বেথুন সোসাইটি (b) এশিয়াটিক সোসাইটি

(c) বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (d) ইন্ডিয়ান সোসিওলজিক্যাল সোসাইটি

উঃ (a) বেথুন সোসাইটি

(xiv) জি.কে. গোখলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা বিলের প্রধান লক্ষ্য ছিল–

(a) অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

(b) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(c) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(d) বালকদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

উঃ (d) বালকদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(xv) এম.এন. শ্রীনিবাস কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রবর্তক?

(a) দান্দ্বিক (b) কার্য-কাঠামো (c) ভারততাত্ত্বিক (d) ঐতিহাসিক

উঃ (b) কার্য-কাঠামো

(xvi) কৃষির বাণিজ্যকরণ সূচনা হয়

(a) প্রাক-ব্রিটিশ সময়ে (b) ব্রিটিশ সময়ে

(c) স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে (d) উদারনীতিকরণের পরে

উঃ (b) ব্রিটিশ সময়ে

(xvii) "ইলেকট্রনিক মানি" ধারণাটি যুক্ত _____ -এর সাথে।

(a) বিশ্বায়ন (b) দুর্নীতি (c) আইন (d) আধুনিকীকরণ

উঃ (a) বিশ্বায়ন

(xviii) _____ ভারতীয় যৌথ পরিবারের বৈশিষ্ট্য।

(a) যৌথ কর্তৃত্ব (b) ভোগ একক

(c) যৌথ সম্পত্তি (d) আলাদা রান্নাঘর

উঃ (c) যৌথ সম্পত্তি

(xix) _____ ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করার এক জ্বলন্ত সমস্যা।

(a) প্রাদেশিকতাবাদ (b) দাঙ্গা

(c) গৃহযুদ্ধ (d) সন্ত্রাসবাদ

উঃ (d) সন্ত্রাসবাদ

(xx) 'Caste' শব্দটির উৎস 'Casta', এটি একটি _____ শব্দ।

(a) ফরাসি (b) স্প্যানিশ (c) আরবি (d) গ্রিক

উঃ (b) স্প্যানিশ

(xxi) 'নঈ তালিম' _____ -এর চিন্তার ফলশ্রুতি।

(a) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (b) মহাত্মা গান্ধি

(c) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (d) স্বামী বিবেকানন্দ

উঃ (b) মহাত্মা গান্ধি

(xxii) ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে বোঝায়

(a) রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী (b) রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে না

(c) (a) ও (b) উভয়েই (d) (a) ও (b) কোনোটিই নয়

উঃ (b) রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে না

(xxiii) ভারতবর্ষে পরিবেশ সুরক্ষা আইন চালু হয় _____

(a) 1980 সালে (b) 1986 সালে

(c) 1988 সালে (d) 1991 সালে

উঃ (b) 1986 সালে

(xxiv) অন্ত্যোদয় যোজনা হল–

(a) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি (b) নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি

(c) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (d) নারী স্বাধীনতা কর্মসূচি।

উঃ (a) দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি

3. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও। (বিকল্প প্রশ্নগুলি লক্ষণীয়) 1×16=16

(i) জনবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয় কী?

উঃ জনবিদ্যা হল জনসংখ্যার বিজ্ঞান, যেখানে জনসংখ্যার পরিবর্তিত কাঠামো যেমন জনসংখ্যার ঘনত্ব, জন্ম-মৃত্যু হার, দারিদ্রতা, বাল্যবিবাহ, শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, স্বাস্থ্য-সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অথবা

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুটি কারণ লেখো।

উঃ (1) জন্মহার ও মৃত্যুহারের পার্থক্য।

(2) চিকিৎসা পরিষেবার উন্নতি।

(ii) সর্বশিক্ষা অভিযানের লক্ষ্য কী?

উঃ সর্বশিক্ষা অভিযান ২০০০ সালে ঘোষিত হয় যেখানে সংবিধানের ৮৬ তম সংশোধনী অনুযায়ী ৬-১৪ বছর বয়সী শিশুদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রারম্ভিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই অভিযান জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শিশুদের বিকল্প ও উদ্ভাবনী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করে।

(iii) জনজাতির দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ (1) জনজাতিদের নিজস্ব একটি পৃথক সংস্কৃতি বিদ্যমান।

(2) এরা বিশ্বাস করে এদের সকলের পূর্বপুরুষ এক।

(iv) বুনিয়াদী শিক্ষা কী?

উঃ বুনিয়াদী শিক্ষা হল শিশু কিশোরের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাসমূহের সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন এবং জাতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করা। বুনিয়াদী শিক্ষা কাজের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন, স্বনির্ভরতা এবং ব্যক্তির ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের উপর জোর দেয়।

(v) 'সংস্কৃতায়ন' বলতে কী বোঝ?

উঃ যে উপায় বা পদ্ধতিতে একটি নিম্নস্তরের হিন্দু জাতি, উপজাতি বা অন্য কোনো গোষ্ঠী কোনো উচ্চজাতি বা দ্বিজ জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) অনুসরণে নিজের রীতিনীতি, আদর্শ, প্রথা এবং জীবনযাত্রা পরিবর্তন করে এবং কালক্রমে দু'এক পুরুষের ব্যবধানে তা হয়ে ওঠে— এই প্রক্রিয়াকে সংস্কৃতায়ন বলে।

অথবা,

যজমানি ব্যবস্থার দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উঃ (1) এটি ছিল ধারাবাহিক, দীর্ঘস্থায়ী এবং বংশপরম্পরাগত।

(2) যজমান ও কামিনের মধ্যে ঊর্ধঃতন ও অধঃস্তন কর্তৃত্ব দেখা যেত।

(vi) UNESCO-র পূর্ণ রূপটি লেখো।

উঃ UNESCO-র পূর্ণ রূপটি হল— "United Nations Educational Scientific & Cultural Organization".

অথবা,

JNNURM-র পূর্ণ রূপটি লেখো।

উঃ JNNURM-র পূর্ণ রূপটি হল— "Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission, 2005"।

(vii) ভারতে দৃষ্টবাদের জনক কাকে বলা হয়?

উঃ ভারতে দৃষ্টবাদের জনক বলা হয় হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ স্যামুয়েল লব-কে।

অথবা,

কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি বলতে কী বোঝায়?

উঃ এটি ক্রিয়াবাদ থেকে আগত যেখানে মনে করা হয়, জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও কার্যকারিতার ফলে যেমন সমগ্র জীবদেহটি গড়ে ওঠে, তেমনি সমাজের ক্ষেত্রেও এ রকম বহু অংশ পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নিরিখে কাজ করে চলে। অর্থাৎ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমগ্র সমাজ কাঠামোর সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন অংশ-এর পারস্পরিক সম্পর্ক, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধরন বিশ্লেষিত হয়ে থাকে।

(viii) ICSSR-র পূর্ণরূপটি কী?

উঃ ICSSR-র পূর্ণরূপটি হল– "Indian Council of Social Science and Research".

অথবা

'Social Background of Indian Nationalism' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

উঃ 'Social Background of Indian Nationalism' গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন– A.R. Desai।

(ix) দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের একটি কর্মসূচির নাম লেখো।

উঃ দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণের একটি কর্মসূচি হল— MGNREGA– Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005।

(x) 'নব্য বঙ্গ' আন্দোলনের প্রধান নেতা কে ছিলেন?

উঃ 'নব্য বঙ্গ' আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন Henry Louis Vivian Derozio.

(xi) এক কথায় 'সর্বোদয়'-র অর্থ কী?

উঃ গান্ধিজির মতে 'সর্বোদয়'-এর অর্থ হল— 'সকলের কল্যাণ'– যেহেতু সকলের জীবিকার্জনের সমান অধিকার রয়েছে, সেহেতু উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য অভিন্ন।

(xii) জাতি ও শ্রেণির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো।

উঃ **জাতি :** আরোপিত মর্যাদা

শ্রেণি : অর্জিত মর্যাদা

জাতি : অনমনীয় ও অপরিবর্তনশীল

শ্রেণি : নমনীয় ও পরিবর্তনশীল।

অথবা,

'আর্য সমাজ' কবে, কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ ১৮৭৫ সালের এপ্রিল মাসে বোম্বাইতে 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী।

(xiii) যৌথ পরিবারের একটি সুবিধা লেখো।

উঃ যৌথ পরিবারের একটি অন্যতম সুবিধা হল ব্যক্তির মৌলিক চাহিদা পূরণ করে তাকে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগান সুনিশ্চিত করে।

অথবা,

সত্যশোধক সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?

উঃ সত্যশোধক সমাজের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন Jyotiba Phule। (জ্যোতিবা ফুলে)

(xiv) ভূমি সংস্কারের অর্থ কী?

উঃ 'লাঙল যার জমি তার'— এই নীতির বাস্তবায়নের জন্য ভূমিকে ঘিরে আইন প্রণয়ন ও নিয়ম-নীতি পরিবর্তন। এর ফলে অপারেশন বর্গা-র মাধ্যমে বর্গাদারদের দ্রুত তালিকাভুক্ত করে তাদের প্রাপ্য জমির ওপর আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ভূমিহীন কৃষকদের ন্যূনতম জমি প্রদান সুনিশ্চিত করা গেছে।

(xv) স্বায়ত্তশাসন বলতে কী বোঝ?

উঃ স্বায়ত্তশাসন বলতে বোঝায় যেখানে জেলা, মহকুমা, গ্রামের প্রশাসনিক কার্যকলাপ রাষ্ট্র ও জনগণের যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় অথবা মানুষ নিজেরাই শাসন কার্য চালায়।

অথবা

স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অর্থনীতি কেমন ছিল?

উঃ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের অর্থনীতি ছিল কৃষি এবং সহজ-সরল যন্ত্রপাতি নির্ভর। বিনিময় প্রথার মাধ্যমে চাহিদা, উৎপাদন ও জোগান-এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকতো। এই সময় জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিষয়টি গড়ে ওঠেনি। জমির যৌথ মালিকানা দেখা যেত।

(xvi) Subaltern ধারণাটি কে প্রথম চয়ন করেন?

উঃ ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আন্তেনিয়ো গ্রামশি প্রথম 'Subaltern' ধারণাটি চয়ন করেন।

Price : ₹ 40/- only

Printed at Saraswaty Press Ltd.